আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা
১-১৫ জুলাই ২০২০ ১৬-৩০ আষাঢ় ১৪২৭

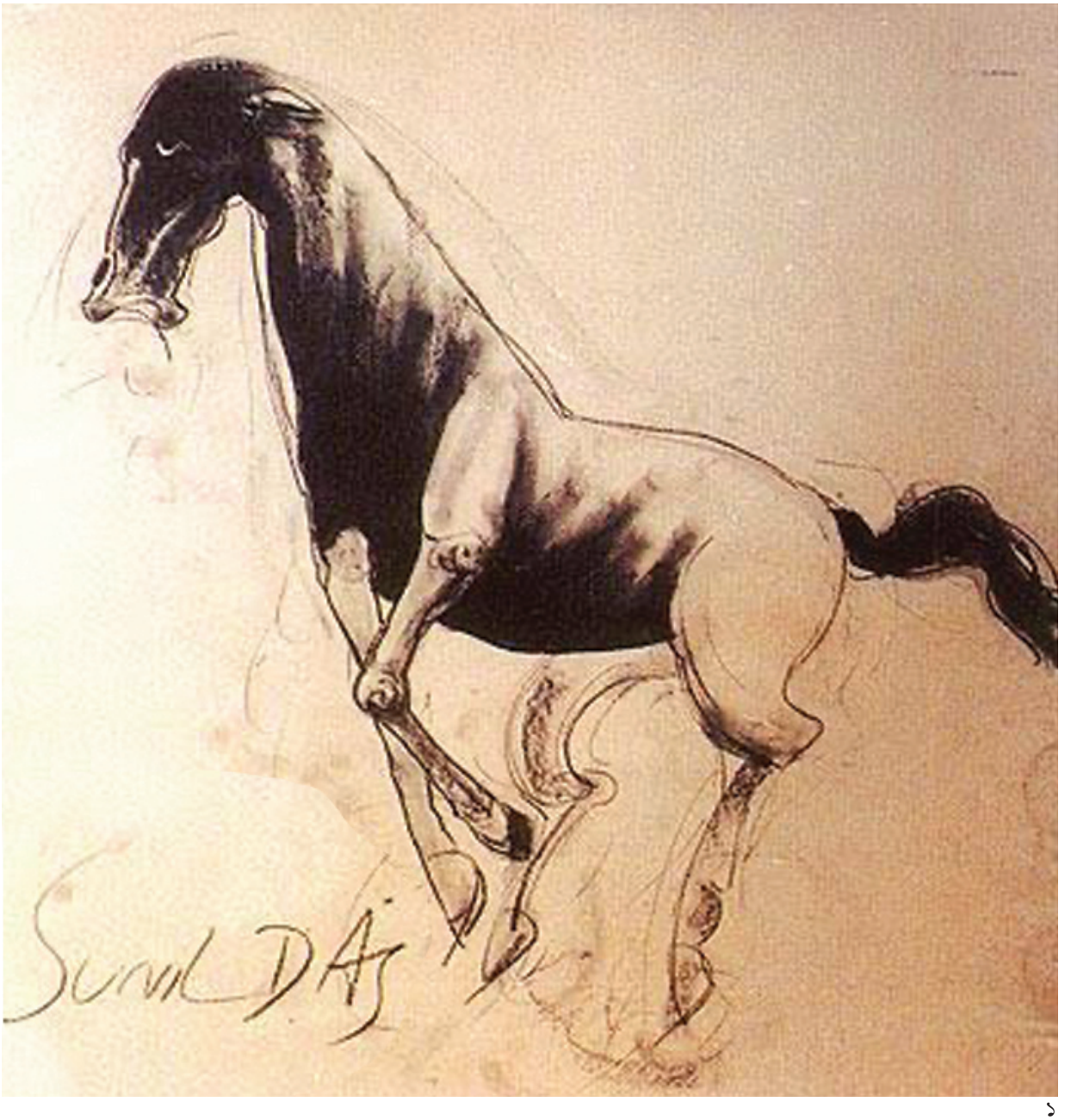

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী
subhanilc@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তর
আরেক রকম
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা
বার্ষিক সডাক ৭০০ টাকা
এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে তাঁকে *আরেক রকম*-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী
সমাজ চর্চা ট্রাস্ট
কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)
৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা
রবিন মজুমদার
৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা ১-১৫ জুলাই ২০২০,
১৬-৩০ আষাঢ় ১৪২৭
Vol. 8, Issue 8th, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য
অমিতাভ রায়

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
ছবি: সুনীল দাস

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা ত্রিশ টাকা
বার্ষিক সডাক সাতশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

সম্পাদকীয়
ভারতের পররাষ্ট্র নীতি ও লাদাখের লড়াই ৫
আসল ভাইরাস কোথায় লুকিয়ে? ৮

সমসাময়িক
আকাশচুম্বী পেট্রোল-ডিজেল ১০
পিএম কেয়ার্স ফান্ড অথবা বেপরোয়া লুট ১২
প্রেস সাপ্রেস তথ্য সাম্রাজ্যবাদ ১৪

লকডাউন ও কোভিড সংক্রমণ: তথ্য কী বলছে?
ইন্দ্রনীল চৌধুরী ১৬

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে
পরিবর্তনের ধারায় কিছু নূতনত্ব
অরুণ সোম ২১

আমফান ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণ
প্রসেনজিৎ বসু ও শুভনীল চৌধুরী ২৫

অতিমারি ও সামাজিক অভিঘাত: বিকল্পের সন্ধানে কেরালা
শৌভনিক রায় ২৯

দারিদ্র ও লকডাউন
ইন্দ্রনীল
সুমিত মজুমদার ৩৩

উন্নয়নের জোয়ার ভাঁটায়
অর্ধেন্দু সেন ৩৬

"আত্মনির্ভর ভারত"?
শাশ্বত ৩৯

মোদী সরকার বনাম প্রকৃতি ও আদিবাসী
সমর বাগচী ৪২

এলআইসি— দেশের গর্ব
চন্দ্রশেখর বসু ৪৬

বদলে গেলেন কেজরিওয়াল
গৌতম হোড় ৪৮

লিওপোল্ড, কঙ্গো এবং বেলজিয়াম
বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী ৫২

ফুটকি-সমাচার
পবিত্র সরকার ৫৫

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

Social Scientist

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তথ্যনির্ভর চিন্তাশীল প্রবন্ধসমষ্টি। বছরে ছ'টি সংখ্যা। কয়েক দশক ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

চাঁদার হার

এক বছর : ৩০০ টাকা
দুই বছর : ৫০০ টাকা
তিন বছর : ৬০০ টাকা

সম্পাদক

প্রভাত পট্টনায়ক

সম্পাদকমণ্ডলী

মধু প্রসাদ, উৎসা পট্টনায়ক, বি. রঘুনন্দন
সি. পি. চন্দ্রশেখর, জয়তী ঘোষ, বিশ্বময় পতি

সম্পাদকীয় দপ্তর

৩৫এ/১ শাহপুর জাট
নতুন দিল্লি ১১০০৪৯

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

ভারতের পররাষ্ট্র নীতি ও লাদাখের লড়াই

চিন ও ভারতের মধ্যে উদ্ভূত বর্তমান সীমান্ত অশান্তি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বিশেষ করে পৃথিবীর বৃহত্তম দুই দেশ যখন করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ছে, সেই সময় চিনের সৈন্যরা লাদাখের গালওয়ান উপত্যকা, পাংগং সো লেক ও অন্যত্র যেভাবে সীমা উল্লঙ্ঘন করে ভারতের ভূখণ্ডে এসে ডেরা বসাচ্ছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই অনুপ্রবেশ রোধ করতে গিয়ে ভারতের ২০ জন সৈন্য নিহত হয়েছেন। সমগ্র দেশ চিনের এই অনাহূত অনুপ্রবেশের নিন্দা করেছে এবং শহীদ সৈন্যদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

অথচ, বহু প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। বরং বেশ কিছু নতুন প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। সেনা সংঘর্ষের এক মাসের বেশি সময় আগে থেকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে লাগাতার খবর আসছিল, প্রাক্তন সেনাকর্তারাও বলছিলেন যে লাদাখ সীমান্তে চিন অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছে, বেশ কিছু অঞ্চলে তারা ইতিমধ্যেই ভারতের ভূখণ্ডে ঢুকে এসেছে। যেই সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সদা খড়্গহস্ত, পুলওয়ামায় কারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটালো তা তদন্ত করার আগেই পাকিস্তানে বিমান হামলা চালায়, সেই সরকার চিনের ফৌজের অনুপ্রবেশের বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করল না দীর্ঘদিন। ভারতের জনগণকে পরিষ্কারভাবে জানালো হল না যে লাদাখ সীমান্ত ঠিক কী ঘটছে। কিন্তু কিছু যে ঘটছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল ৬ জুন। ওইদিন চিন ও ভারতের সীমান্তে সামরিক আধিকারিকদের আলোচনা হয়। এই আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে সীমান্তে স্বাভাবিক অবস্থা ফেরাতে দুই সৈন্যবাহিনি কাজ করবে। তবু সেই সমঝোতার বিপরীতে গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় ভূখণ্ডে ভিতরে চিন ও ভারতের সৈন্যের সংঘর্ষে ২০ জন সৈন্য নিহত হন।

চিন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত চুক্তি এখনও হয়নি। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যেমন সুনির্দিষ্ট সীমানা আছে, চিনের সঙ্গে, বিশেষ করে কাশ্মীর সংলগ্ন সীমান্তে সেরকম কোনো নির্দিষ্ট সীমান্ত নেই। যা আছে তাকে বলা হয় 'লাইন অফ এ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল'। তাই কোনটা ভারতের সীমানা আর কোনটা চিনের তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে দুই দেশের

মধ্যে। কিন্তু গালওয়ান উপত্যকা বা পাংগং সো লেক যে ভারতের সীমানার মধ্যে এই কথা বিগত ৬০ বছরে কোনোদিন চিন অস্বীকার করেনি। কিন্তু এইবার তারা গালওয়ান উপত্যকায় নিজেদের সার্বভৌমত্ব দাবি করছে এবং ভারতকে দায়ি করছে তাদের সীমানায় অনুপ্রবেশের জন্য। হঠাৎ করে চিন কেন এহেন অবস্থান গ্রহণ করছে সেই প্রশ্নে আশার আগে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যিক।

নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মোট চারবার চিন সফরে গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে গেছেন পাঁচ বার। চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং-এর সঙ্গে উহানের হ্রদে নৌকাবিহার, গান্ধির সবরমতী আশ্রমে দোলনায় দোল, তামিলনাড়ুর মমাল্লাপূরমের প্রাচীন স্থাপত্যের প্রেক্ষাপটে তাঁদের আলাপচারিতা গোটা বিশ্ব দেখেছে। এহেন বন্ধুত্বের ছবি হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল কেন? তীব্র জাতীয়তাবাদের স্লোগান তোলা প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে দেশবাসীর সামনে চিন নাম পর্যন্ত নিচ্ছেন না। বরং ১৯ জুন সর্বদলীয় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে দিলেন যে কোনো অনুপ্রবেশ হয়নি, কেউ আমাদের ভূখণ্ডের জমি দখল করে নেই। এখানেও তিনি সর্বনাম ব্যবহার করলেন, চিনের নাম নয়। কেন? তার থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ এই বক্তব্য যে কোনো অনুপ্রবেশ ঘটেনি। প্রধানমন্ত্রীর এহেন বক্তব্যের পরেও উপগ্রহ চিত্রে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে গালওয়ান উপত্যকায় শুধু যে চিনের সৈন্য রয়েছে তা নয়, তারা সেখানে পরিকাঠামো তৈরি করার চেষ্টা করছে। চিনে অবস্থিত ভারতের রাষ্ট্রদূত বলেছেন চিনা সেনার উচিত ভারতের ভূখণ্ড ছেড়ে নিজেদের সীমানায় ফিরে যাওয়া। ১৭ জুন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষ্কার জানান যে সৈন্য সংঘর্ষ ভারতের সীমান্তে হয়েছে। অর্থাৎ চিনা সৈন্য সীমানা উল্লঙ্ঘন করে ভারতে ঢোকে। লাদাখের বাসিন্দা তথা কারগিল যুদ্ধের নায়ক, মহাবীর চক্রে ভূষিত, কর্ণেল সোনাম ওয়াংচুক দ্যর্থহীন ভাষায় বলেন মোদীর বক্তব্যের সঙ্গে লাদাখের বাস্তব মিলছে না। অর্থাৎ চিনা অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

প্রধানমন্ত্রীর এহেন বক্তব্যকে হাতিয়ার করতে চিন সময় নষ্ট করেনি। তাঁরা বিশ্বের সামনে বলেছে যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন যে চিন সীমান্ত উল্লঙ্ঘন করেনি। চিন যদি ভারতের সীমান্তে না ঢুকে থাকে, তাহলে ২০ জন সৈন্য শহীদ হলেন কী করে? তাঁরা কী চিনের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন? প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরে এই প্রশ্ন উঠছে। শুধু তাই নয়, গালওয়ান উপত্যকার উপর সার্বভৌমত্বের যে দাবি চিন করছে তা অন্যায্য হলেও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের ফলে চিন তাকে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এখানেই কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের তুলতেই হবে। প্রথমত, প্রধানমন্ত্রী, যিনি বিগত ছয় বছরে অগুন্তি বিদেশ সফর করেছেন, চিনেও গেছেন একাধিকবার, তিনি কেন চিনা অনুপ্রবেশ বলতে দ্বিধা বোধ করছেন? এর কারণ খুব অস্পষ্ট নয়। চিন ভারতের তুলনায় সামরিকভাবে শক্তিশালী দেশ। এমতাবস্থায় চিন যদি সত্যিই ভারতের ভূখণ্ডে ঢুকে থাকে তবে তাকে সামরিকভাবে হঠাতে হলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে, যা কাম্য নয়। তাই কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। কিন্তু ৫৬ ইঞ্চির ছাতির প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভক্তদের বুঝিয়েছেন যে 'ঘর মে ঘুসকে মারেঙ্গে'। পাকিস্তান মুসলমানদের দেশ, দুর্বল দেশ। সেখানে বিমান হানা চালিয়ে মোদী রাজনৈতিক ফায়দা তুলেছেন। কিন্তু চিন মুসলমান দেশ নয়, এবং শক্তিশালী। তাই চিনের ঘরে ঢুকে মারব, এই কথা প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেন না। আবার, চিন ঢুকে পড়েছে আর আমাদের 'রাম্বো' প্রধানমন্ত্রী শুধু আলোচনার কথা বলছেন, এমন হলে ভক্তকূলের চোখে প্রধানমন্ত্রী দুর্বল হয়ে পড়বেন। তাই দেশের কিছু জমি যদি চিনের কব্জায় থাকে তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ছবি বা ইমেজে যেন কোনো দুর্বলতার দাগ না লাগে। অতএব, সত্যকে আড়াল করে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে চিনের সৈন্য ভারতের সীমানার ভিতরে অবস্থিত নয়। যদিও উপগ্রহ চিত্র ও বিশেষজ্ঞরা অন্য কথা বলছেন।

তাহলে কী করণীয়? গোটা দেশে জিগির তোলা হচ্ছে চিনা পণ্য বয়কট করার। কেউ টিভি ছুঁড়ে ভেঙে ফেলছে, কেউ বলছেন চিনা খাবার নিষিদ্ধ করতে হবে। দেশপ্রেমের জোয়ার বইছে দেশে। কিন্তু চিনা পণ্য বয়কট কোনো সমাধান নয়, এবং এই বয়কট সম্ভবও নয়। চিনের রপ্তানির মাত্র ৩ শতাংশ ভারতে আসে। কিন্তু ভারতের আমদানির ১৪ শতাংশ আসে চিন থেকে। তদুপরি, পেটিএম, স্ন্যাপডিল-সহ বহু ভারতীয় কোম্পানিতে চিনা বিনিয়োগ রয়েছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ পণ্য চিনা সামগ্রী ব্যতিরেকে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। হঠাৎ করে সব বয়কট করা সম্ভব নয়। চিন থেকে আমদানি বন্ধ করে দিলে দেশে অর্থনৈতিক সংকট আরো তীব্র হবে। দেশকে যদি আত্মনির্ভর করতেই হয় তবে তার জন্য ধৈর্য সহকারে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে, পরিকাঠামো বাড়াতে হবে,

শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে হবে। সেই সব কিছু না করে চিনা পণ্য বয়কট করার ডাক নিছক ফাঁপা হুজুগ ছাড়া আর কিছু নয়। বিজেপি জানে চিনকে সামরিকভাবে টেক্কা দেওয়া মুশকিল তাই এই সব জিগির তুলে মানুষের মন ভোলাতে চাইছে।

এই সব বালখিল্য কার্যকলাপের বাইরে বেড়িয়ে যেই গুরুতর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন তা হল চিনের এই কার্যকলাপের নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে। এর কোনো উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কিছু কথা বলা আবশ্যিক। প্রথমত, চিন এশিয়ার সর্ববৃহৎ শক্তি শুধু নয়, তারা বিশ্বের একটি মহাশক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। করোনা সংক্রমণ এবং শুরুতে তাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চিনের ভাবমূর্তির ক্ষতি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রশ্নে চিনকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে সীমান্ত সংঘর্ষের আবহে চিন নিজের দেশে জাতীয়তাবাদ এবং সরকারের পক্ষে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে বলে অনেকে মনে করছেন। তবু, এই ব্যাখ্যায় কেন হঠাৎ ভারতের সঙ্গেই চিনের সম্পর্কের অবনতি হল সেই প্রশ্নের উত্তর নেই।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের ভারতের পররাষ্ট্রনীতি এবং অভ্যন্তরীণ নীতি উভয়ের দিকেই তাকাতে হবে। ভারত বিগত ১০ বছরের অধিক সময় ধরে ক্রমাগত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। করোনা সংক্রমণের মধ্যে ট্রাম্পকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে আহমেদাবাদে। অস্ট্রেলিয়া, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত সামরিক রণনীতিগত বোঝাপড়ায় ঢুকে পড়ছে। তদুপরি, পাকিস্তানের বালাকোটে ভারতের বিমান হানার পরিপ্রেক্ষিতে চিন বা ভারতের অন্যান্য প্রতিবেশীরা মনে করছে যে ভারত আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে নিজেকে মহাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। চিন মনে করছে এইভাবে ভারত যদি ক্রমাগত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্বাধীন জোটে ঢুকে পড়ে এবং অঞ্চলে নিজের সামরিক শক্তি জাহির করে তবে তার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা ঠিক হবে না। তারাও দেখিয়ে দিতে চাইছে এশিয়ার প্রকৃত শক্তিধর দেশ কোনটি।

ভারতের অভ্যন্তরে কাশ্মীর সংক্রান্ত প্রশ্ন আমাদের প্রতিবেশীদের বিরক্ত করেছে। হঠাৎ করে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করা হল, জম্মু কাশ্মীর রাজ্য থেকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে রূপান্তর করা হল। বিশেষ করে লাদাখকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ঘোষণা করায় চিনের আপত্তি ছিল। তদুপরি, সংসদে দাঁড়িয়ে দেশের গৃহমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীর এবং আকসাই চিনকে ভারতের সীমানায় নিয়ে আসতে তারা নাকি বদ্ধপরিকর। চিন এহেন ঘোষণাকে আগ্রাসন হিসেবে দেখেছে। বিশেষ করে ভারত লাদাখের সীমান্ত অঞ্চলে পরিকাঠামো বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে চিন তার প্রতিবাদ জানায় এবং একেও আগ্রাসী মনোভাব বলে ব্যাখ্যা করে।

অন্যদিকে, নেপালের মতন আমাদের সুপ্রাচীন বন্ধু দেশ নতুন মানচিত্র বানিয়ে সেখানে বিতর্কিত জমি, যা ভারত নিজের বলে দাবি করে, তাকে নেপালের অংশ হিসেবে দেখিয়েছে। বহুদিন ধরে নেপাল এই প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে আলোচনা চাইছিল। কিন্তু ভারত গচ্ছংগয়ং মনোভাব দেখিয়ে তা করেনি। ফলত, বর্তমানে নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বরাবরই সমস্যার। সেখানে বালাকোটকে কেন্দ্র করে সমস্যা আরো বেড়েছে। নেপাল আমাদের হাত ছেড়েছে, বাংলাদেশ সিএএ-এনআরসিকে কেন্দ্র করে ভারতের উপর বিরক্ত, শ্রীলঙ্কা চিনের সঙ্গে অধিক বন্ধুত্ব রাখছে। আর চিন আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ভূখণ্ডে ঢুকেছে। প্রত্যেকটি প্রতিবেশী দেশ আজ আমাদের উপর বিরক্ত বা বৈরিতাপূর্ণ মনোভাব নিচ্ছে।

মোদী ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পরে ৫০টির বেশি দেশে বিদেশ সফর করেছেন, ২০০০ কোটি টাকার বেশি খরচ হয়েছে এই সফরে। অথচ, আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে অবনতি হয়েছে। মোদীর পররাষ্ট্রনীতি যে ব্যর্থ হয়েছে তা প্রমাণ করতে এর থেকে বেশি তথ্য লাগে না। আসলে, রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে সুন্দর ছবি তোলা আর সাংবাদিক সম্মেলন করলেই পররাষ্ট্র নীতি কার্যকরী হয় না। এর জন্য চাই কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তরে গভীর পর্যবেক্ষণ, মতের আদান প্রদান এবং দেশের রণনীতিগত স্বচ্ছ বোঝাপড়া। মোদী সরকারের যা নেই।

চিন বা অন্য কোনো দেশের সঙ্গে যুদ্ধ কোনো সমাধান হতে পারে না। ভারতের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা অবশ্যম্ভাবী। চিন যদি ভারতের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে থাকে তাহলে তাদের সীমান্তের ওপারে পাঠাতে বাধ্য করতে হবে। এর জন্য চিনের সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনা শুরু করতে হবে যার লক্ষ্য হওয়া উচিত সীমান্ত প্রশ্নে স্থায়ী সমাধানের দিকে এগোনো।

আসল ভাইরাস কোথায় লুকিয়ে?

মহামারি, অতিমরি, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, করোনা, যে ভাইরাসটিকে সামনে এনে দিল, তার আসল নাম মানুষের লোভ। আবার এই লোভকে অন্য কিছু ভারি নামেও ডাকা যেতেই পারে, যেমন পুঁজিবাদ, অথবা ভোগবাদ। এই বিশ্বের সমস্ত কিছুর উপর দখল বসাবার যে দুর্নিবার লোভ, প্রকৃতিকে নিজের অধীনে এনে জল জঙ্গল আকাশের উপর একচ্ছত্র অধিকার বসিয়ে সব লুটেপুটে নেবার বাসনা, করোনা তারই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। আর সে কারণেই এই আঘাত ঠিক ততদিন স্থায়ী হবে, যতদিন না এই দখলের প্রবণতা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসা যায়।

এই দাবি বরাবরই বিভিন্ন আদিবাসী এবং জনজাতির প্রতিনিধিরা গত বেশ কিছুদিন ধরে করে আসছেন যে করোনা সংক্রমণের অন্যতম প্রধান কারণ হল জীববৈচিত্র, অরণ্য ও জলাভূমির নির্বিচারে ধ্বংসসাধন। করোনার উৎস বাদুড় কী না, সেই নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। যেটা তর্কহীন মেনে নেওয়া যায়, তা হল বন্য কোনো প্রাণী থেকেই এই ভাইরাস ছড়িয়েছে। তা বাদুড় হতে পারে বা প্যাংগোলিন। যদি গত কুড়ি বছরে নেচার, ল্যান্সেট ইত্যাদি পত্রিকায় বন্যপ্রাণী এবং তাদের থেকে উদ্ভূত রোগগুলি সম্বন্ধীয় গবেষণাপত্রগুলির অনুসন্ধান করা হয়, দেখা যাবে, ১৯৬৬ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত যে ৩৫৫টি নতুন ব্যাধি পৃথিবীর দেখা দিয়েছে, তার ৬০ শতাংশ এসেছে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী থেকে। বিশ শতকের শেষ দুই দশকে যে ১৭৫টি সংক্রামক জীবাণু মানবসমাজে দেখা গিয়েছে এবং যেগুলির আরো তীব্র হয়ে ওঠার আশঙ্কা আছে, তার মধ্যে ১৩২টি অর্থাৎ ৭৫ শতাংশ এসেছে বন্য জীবজন্তু থেকে। আর এই সময়কালেই বিশ্বের অরণ্য, বন্যপ্রাণী, জলাভূমি ইত্যাদির বেনজির নিধন ঘটেছে দুনিয়াজুড়ে। মূলত অরণ্য ও জলাভূমি ধ্বংসের কারণে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। বেড়ে যাচ্ছে প্রাণী থেকে মানবশরীরে সংক্রমণের আশঙ্কা।

এ বিষয়ের তত্ত্বায়ণ সম্পর্কিত 'গানস, জার্মস এন্ড স্টিল' প্রবচনটি বর্তমানে বহু আলোচিত। বলা হয়, উপনিবেশ স্থাপনের সময়কালে যে তিনটে ফ্যাক্টর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, অস্ত্র, লৌহজাত আকরিকের উপর দখল এবং জীবাণু। অস্ত্রের মাধ্যমে বলপ্রয়োগে দমননীতি সম্ভব হয়েছিল দখলীকৃত দেশটির আদিবাসীদের উপর। লোহার উপর দখলের মাধ্যমে সেই দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণে এনে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল দ্রুত। আর শেষ অস্ত্র, জীবাণু। এক একটা করে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক অভিযান হয়েছে এবং আদিবাসীদের একটা বিরাট অংশ অভিযাত্রীদের দেহ থেকে আগত মারাত্মক সব জীবাণু, যা এতদিন ধরে অচেনা ছিল, সেগুলির প্রকোপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। বিলুপ্ত হয়ে গেছে অসংখ্য উপজাতি। প্রতিরোধহীন উপনিবেশের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করে দখলদার বাহিনী চালিয়েছে তার সভ্যতা ও উন্নয়ন নামক বিজয়রথের চাকা। তবুও এতদিন সেটা ছিল মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণ। প্লেগ বাদে অতীত ইতিহাসে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রাণঘাতি মহামারী রোগ পাওয়া যায় না যা বন্যপ্রাণী থেকে মানুষের শরীরে এসেছে। উত্তর ঔপনিবেশিক দুনিয়াতে নির্বিচারে প্রকৃতি ধ্বংসের পরে সেটুকু বাধাও আর নেই। এইচআইভি (উৎস: বাঁদর), ইবোলা (উৎস: বাঁদর ও বাদুড়), নিপা (উৎস: শুয়োর), মারবুর্গ (উৎস: বাঁদুর), মের্স (উৎস: উট), লাসা জ্বর (উৎস: ইঁদুর), সার্স (উৎস : বাদুড়), জিকা (উৎস: বাঁদর), ওয়েস্ট নাইল (উৎস: বন্যপাখি) ইত্যাদির সংক্রমণ ক্রমশই পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমরা ক্রমান্বয়ে প্রাণিজগৎ ও মানবসমাজের মধ্যের লক্ষণরেখা লঙ্ঘন করে চলেছি। ভূমিক্ষয় আর বনজঙ্গল কেটে ফেলার মাধ্যমে বিভিন্ন জীবজন্তুর স্বাভাবিক বাসস্থান নষ্ট হয়ে গেলে তাদের পরিমণ্ডলে যে সমস্ত জীবাণু রয়েছে, সেগুলি সহজেই লোকালয়ে চলে আসতে পারে। কারণ সেই উৎখাত হওয়া বন্যপ্রাণীরা খাবারের খোঁজে লোকালয়ে চলে আসছে। আর তাদের থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে এমন সব জীবাণু, যারা সেই সব প্রাণীদেহের মধ্যে থাকার সময়ে ক্ষতিকর ছিল না, কিন্তু মানবশরীরের পক্ষে প্রাণঘাতী। আর এটা শুধুমাত্র অরণ্যনিধনের মাধ্যমেই যে হচ্ছে, সেটাও নয়। রাস্তা নির্মাণ, খনির পত্তন, রেললাইন বসানো ইত্যাদির প্রভাবে যে ব্যাপক ভূমিক্ষয় এবং একটা বড়ো অংশের বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংস হচ্ছে, তার ফলেও বহু ছোটোখাটো প্রাণী, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় এবং পাখি লোকালয়ে চলে আসছে। ক্রসওভার ঘটছে মারণ জীবাণুর। আর এই পুরোটাই

ঘটছে সভ্যতা ও উন্নয়ন নামক আদি যুক্তিবাদী কাঠামোর থেকে বাইরে বেরিয়ে আমাদের ভাবনাচিন্তা না করবার ফলে।

এর মানে সভ্যতাকে অস্বীকার করা নয়। কিন্তু প্রশ্ন তোলবার কাজটাও তো অন্তত করা যেতে পারত! প্রাক-পুঁজিবাদী যুগের ভারতবর্ষের আদিগ্রামসমাজ, তার কৌমকাঠামো, স্থবির ধর্মীয় রক্ষণশীলতা এবং অনগ্রসরতা, এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও কিছু দিকে প্রাজ্ঞতার পরিচয় রেখেছিল, ঠিক যেমন রাখে যেকোনো দেশের আদি জনজাতি। জঙ্গলকে রক্ষা করা, পশুপাখি নিধন না করা, টোটেম সভ্যতার আদিরূপ হিসেবে বন্যপ্রাণের পুজো, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থান ছিল অটুট। এমনকী, দুর্ভিক্ষ বা খরা বন্যা ইত্যাদির মতো দুর্যোগ থাকলেও প্রাক-পুঁজিবাদী ভারতে মহামারীর নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই স্থবিরতা প্রথম ভাঙল রেলগাড়ি। আর তার হাত ধরেই একদিকে যেমন প্রগতির বিস্তার, অপরদিকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে হু হু করে ছড়িয়ে পড়ল ম্যালেরিয়া। বস্তুত, ভারতবর্ষে রেললাইনের বিস্তারের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার যোগ যদি ভৌগোলিকভাবে দেখা যায়, সে বিষয়ে গবেষণাপত্রগুলি যদি পড়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে যে অঞ্চলগুলো দিয়ে রেলগাড়ি গেছিল ঠিক সেই অঞ্চলেই ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়েছিল হু হু করে। মূলত পরিযায়ী শ্রমিকদের মাধ্যমেই। তাই এটা আজ কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়, বরং ইতিহাসের পরিহাসই বলা যায়, যে দেড়শো বছর পেরিয়ে এসে আরেক প্রাণঘাতি মহামারীকে আটকাতে গিয়ে সভ্য ভারতবর্ষ রেলব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের চলাচল আটকাতে বাধ্য হচ্ছে, যে রেলব্যবস্থার প্রচলনের মাধ্যমেই প্রথম একটি রোগ তার আঞ্চলিকতার বেড়া ভেঙে দেশীয় পরিচয় লাভ করেছিল। আজ রেলগাড়ি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অপর একটি রোগকে তার দেশীয় পরিচিতি থেকে ফিরিয়ে এনে আঞ্চলিক পরিধিতে বন্ধ করে রাখার জন্যই, যাতে 'কমিউনিটি স্প্রেডিং' না হয়।

এটা স্পষ্ট করে বোঝা দরকার যে, যেই যুক্তিবাদ আমাদের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিখিয়েছে, সেই একই যুক্তিবাদ নির্বিচারে আমাজন অরণ্য থেকে শুরু করে আফ্রিকার জঙ্গলের উপর একচ্ছত্র হানাদারি চালিয়েছে। যেই যুক্তিবাদ সাম্য গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার ধারণাকে সামনে এনেছে, সেই একই যুক্তিবাদ অধিকৃত উপনিবেশগুলিতে লক্ষ লক্ষ আদিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। যে যুক্তির বলে ফরাসি বিপ্লব হয়েছে, সেই একই যুক্তি বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের আলোকপ্রাপ্ত রাষ্ট্রনায়কদের হাইতির মতো উপনিবেশে দাসব্যবস্থা আগের থেকে তীব্রতর করবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আর এই সমস্তই হয়েছে যুক্তিবাদের পেছনে অন্তর্নিহিত একটিমাত্র সত্যের কারণে— মুনাফা। তাই ইতিহাস মুচকি হাসছে, যখন আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সচিব করোনার কারণ খুঁজতে গিয়ে আদি জনজাতিগুলির মুখপত্রদের কাছে আবেদন করছেন— এমন একটা সময়ে, যখন 'এজ অফ রিজন'-এর সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে গিয়েছে, আমাজন অগ্নিকাণ্ডের মৃত আদিবাসীদের ভূত পাশ্চাত্যকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

কাজেই এটা স্পষ্ট করে বুঝে নিন, করোনা একটি ভাইরাসের নাম এবং সে ভাইরাস হল পুঁজিবাদ। আজ বাদে কাল হয়তো করোনা নামটি চলে যাবে। বিশ্ব আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। কিন্তু পুঁজিবাদ তার সন্তানদের আগলে রেখেই দেবে নিজস্ব কোটরে। নিশ্চুপ নির্জনতায়, যার সন্ধান কেউ পাবে না। তারপর এক নিশ্চিন্ত সকালে, যখন মানুষ বুঝে যাবে যে তার সভ্যতার বিজয়রথের চাকা কেউ থামাতে পারবে না, ঠিক তখনই পুঁজিবাদের এই সন্তানরা আবার পিলপিল করে বেরিয়ে আসবে এক শান্ত সুখী শহরে। অন্য নামে, অন্য চেহারাতে— লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যার উদ্দেশ্যে। যতদিন তা না আসে, প্রগতি ও উন্নয়নের মহোৎসবের নামে আমাদের উপদংশজাত এই সভ্যতার শ্মশাননৃত্য আপাতত চলতেই থাকুক!

সমসাময়িক

আকাশচুম্বী পেট্রোল-ডিজেল

দেশে রসিক লোকের অভাব নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন ভারতকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছেন, ঠিক সেই মোক্ষম সময়ে রসিকদের বেমক্কা ঠাট্টা জাতীয়তাবাদের দুধে কিঞ্চিৎ চোনা দিল বইকি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে সেই রসিকতা। বলা হচ্ছে উদারপন্থীরা মহা ইতর। তাঁরা খামোকা চেঁচায়। মোদী বলেছিলেন দেশে GDP বাড়বে। তাই তো বাড়ছে, G মানে গ্যাস, D মানে ডিজেল আর P অর্থাৎ পেট্রোলের দাম সমস্ত রেকর্ড ভেঙে বেড়ে চলেছে। কেউ কেউ আবার টিপ্পনি কেটে বলছেন মোদী নাকি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যাঁর বয়স পেট্রোলের দামের থেকে কম! মনমোহন সিংহের প্রধানমন্ত্রীত্বে যখন পেট্রোজাত পণ্যের দাম হু হু করে বাড়ছিল, মোদীর সিংহ গর্জন শুনতে লোকে অভ্যস্ত ছিল। আপাতত, তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বে পেট্রোজাত পণ্যের দাম যখন বাড়ছে, মোদী তখন নিরীহ বাছুরের মত শান্ত, মৌন। অন্যদিকে করোনার প্রকোপে মানুষের জীবন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের যখন দোরগোড়ায় ঠিক তখন প্রায় ২২ দিন ধরে লাগাতার বেড়ে চলেছে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম।

বর্তমানে কলকাতা শহরে এক লিটার পেট্রোলের দাম ৮২ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে যার দাম ছিল ৭৩ টাকা। একই সময়ে ডিজেলের দাম জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ৬৫.৬ টাকা থেকে বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ৭৫.৫২ টাকা। পেট্রোল ও ডিজেলের দাম এক মাসে ১০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভারতের ইতিহাসে এর আগে কখনো ঘটেছে বলে জানা নেই। অথচ কী আশ্চর্য! ২০১৯ সালের ১ জুলাই আন্তর্জাতিক বাজারে খনিজ তেলের দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ৫৯ ডলার, যা ২০২০ সালের জুন মাসের ২৬ তারিখে কমে হয় ৩৮.৫ ডলার। ভারত খনিজ তেলের যেই সংস্করণ আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কেনে তার দাম ২০১৯ সালের জুন মাসে ছিল ব্যারেল প্রতি ৬২.৩ ডলার যা ২০২০ সালের মে মাসে কমে হয় ব্যারেল প্রতি ৩০.৬ ডলার। এক বছরের মধ্যে খনিজ তেলের দাম ৫০ শতাংশের বেশি কমেছে, ভারতের ক্ষেত্রে। কিন্তু পেট্রোল বা ডিজেলের দাম এই একই সময়ে প্রতি লিটার প্রায় ১০ টাকা বেড়েছে। কেন?

মোদী ক্ষমতায় আসার পরেই আন্তর্জাতিক বাজারে খনিজ তেলের দাম কমতে থাকে। কিন্তু সেই হ্রাসমান দামের সুফল সাধারণ ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়নি, লাগাতার তেলের উপর মাশুল বাড়িয়ে। লকডাউন চলাকালীন স্বাভাবিকভাবেই পেট্রোজাত পণ্যের চাহিদা কমে যায়, অতএব বিক্রিও কমতে থাকে। এমতাবস্থায় লকডাউনের মধ্যেই কেন্দ্র পেট্রোল ও ডিজেলের উপর মাশুল বাড়ায় যথাক্রমে ১০ টাকা এবং ১৩ টাকা। এই বাড়তি মাশুলের ফলে আপনি যখন এক লিটার তেল কিনছেন, কেন্দ্রীয় সরকারকে কর দিচ্ছেন পেট্রোলের ক্ষেত্রে ৩৩ টাকা এবং ডিজেলের ক্ষেত্রে ৩১.৮৩ টাকা। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের উপর বিক্রয় কর চাপিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পেট্রোলের ক্ষেত্রে ১৩ টাকা এবং ডিজেলের ক্ষেত্রে ৮ টাকা বা তার বেশি কর গুণতে হয়। ইন্ডিয়ান অয়েলের হিসেব অনুযায়ী দিল্লিতে প্রতি লিটার পেট্রোল ও ডিজেলের ক্ষেত্রে কোম্পানি পায় যথাক্রমে ২২.৪৪ টাকা এবং ২৩.৯৩ টাকা (হিসেব ১৬ জুনের)। বাকি আপনি যে ৮০ টাকা দিয়ে পেট্রোল কিনছেন তা সরকারের কোষাগারে চলে যায়, ডিলার কমিশন বাদ দিয়ে।

এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে যা অধিকাংশ সময়ে আলোচনার বাইরে থাকে। খুব ঘটা করে যখন পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি দেশে শুরু করা হয়, তখন বলা হয়েছিল সমস্ত পণ্যকে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে, এক দেশ, এক কর নীতি গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি। অথচ, পেট্রোল ও ডিজেলের মতন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যকে জিএসটি-র আওতার বাইরে রাখা হল কেন? যেহেতু এই দুটি পণ্য অত্যাবশ্যক, এর চাহিদা কোনোদিন কমবে না, যতই দাম বাড়ানো হোক না কেন। অতএব কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি পেট্রোল আর ডিজেলকে সেই সোনার হাঁস ঠাউরালো যা বিনা বাক্যব্যয়ে রোজ সোনার ডিম দেবে। তাই যথেচ্ছভাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি এই পণ্যদুটির

উপর কর চাপিয়ে চলেছে, ফলে দাম বেড়ে চলেছে এবং সাধারণ মানুষ যারা লকডাউনের জন্য রুটি-রুজি হারিয়েছেন তাদের পকেট আবারও কাটা হচ্ছে।

এই কর বাড়ানোর পক্ষে একটি যুক্তি দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে পেট্রোল ও ডিজেলের চাহিদা লকডাউন এবং অর্থনৈতিক মন্দার ফলে কমবে। একই কারণে সরকারের প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ অর্থাৎ আয়কর এবং কর্পোরেট করও কমবে। এমতাবস্থায় সরকারের কোষাগারে টান পড়তে বাধ্য। তাই পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বাড়িয়ে সরকার কোষাগার পূর্ণ করছে, যেই টাকা আবারও মানুষের স্বার্থেই খরচ করা হবে। যুক্তিটি ভ্রান্ত। একথা ঠিক যে সরকারের রাজস্ব আদায় এই বছরে লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক কম হবে। কিন্তু সেই ঘাটতি পেট্রোল ও ডিজেলের উপর কর বসিয়ে পূরণ হবে না। বরং এই কর বসানোর ফলে পরিবহণের মতন পরিষেবা আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই ঘাটতি পূরণের এহেন চেষ্টা না করে সরকারের উচিত বাজার থেকে ধার নিয়ে খরচ চালানো। এই বছর অন্তত রাজস্ব ঘাটতি নিয়ে খুব বেশি মাথা না ঘামালেও চলবে। একান্তই যদি সরকার মনে করে যে বেশি বাজেট ঘাটতি করা যাবে না, তবে সম্পদ করের মাধ্যমে পরে টাকা আদায় করা যেতে পারে। অথবা যদি বাজার থেকে ধার নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দ্বিধা থাকে তাহলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থেকেও সরকার ধার নিয়ে ঘাটতি মেটাতে পারে। কিন্তু সরকার এইসব পথে হাঁটতে নারাজ। মুশকিল হচ্ছে এই দাম বাড়িয়েও বাজেট ঘাটতির উপরে লাগাম টানা যাবে না। তখন সরকার ব্যয়সঙ্কোচনের নীতি নেওয়ার কথা ভাববে, যা জনগণের জীবনে ঘোর সমস্যা তৈরি করবে।

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বিগত ১৫ দিন ধরে বাড়ছে। ফলে, আমাদের দেশের পেট্রোল ও ডিজেলের দামও বাড়তে থাকবে। এমতাবস্থায় সরকারের উচিত মানুষের উপর চাপ কমাতে বর্ধিত কর বাতিল করা। বরং পেট্রোল এবং ডিজেলকে জিএসটি-র আওতায় আনা হলে গোটা দেশে একই দামে এই পণ্য বিক্রি হবে এবং খেয়ালখুশি মতো পণ্যের প্রকৃত দামের দ্বিগুণের বেশি কর এই পণ্যের উপর চাপানো যাবে না। পেট্রোপণ্যকে জিএসটি-র অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জনদরদী এবং দেশের অর্থব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করার দাবি। কিন্তু বিরোধীরাও এই বিষয়ে খুব বেশি সোচ্চার নয়। আর সরকারের কাছে তেলের দাম বৃদ্ধি কোনো সমস্যাই নয়। অতএব জনগণের দুর্ভোগের বিরাম আপাতত নেই।

ছবি : সুরজিৎ সরকার

সমসাময়িক

পিএম কেয়ার্স ফান্ড অথবা বেপরোয়া লুট

মাত্র চার ঘণ্টা। শুরু হল জাতীয় অবরোধ। মাত্র চার দিন। জন্ম নিল এক নতুন তহবিল। পিএম কেয়ার্স ফান্ড।

চব্বিশে মার্চ সন্ধ্যা আটটা নাগাদ দেশের প্রধান সেবক টিভির পর্দায় দর্শন দিয়ে দেশবাসীকে জানালেন রাত বারোটা থেকে অর্থাৎ পঁচিশে মার্চ শুরু হবে জাতীয় অবরোধ। কলকারখানা, আপিস-কাছাড়ি, স্কুল-কলেজ, দোকান-বাজার, যানবাহন চলাচল এককথায় সবকিছুই বন্ধ থাকবে। জরুরি পরিষেবা বাদে জনজীবন স্তব্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা করার সময় জোর দিয়ে বলা হয় যে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্যই এই সিদ্ধান্ত।

আসমুদ্রহিমাচল বিনা প্রতিবাদে নিঃশব্দে এই গুরুত্বপূর্ণ হুকুমনামা তামিল করেছে। কোভিড-১৯ নামের এক অজানা চরিত্রের অণুজীব যেভাবে গোটা পৃথিবীতে মহামারী সৃষ্টি করেছে তার মোকাবিলায় অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও জাতীয় অবরোধের মতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। যে অসুখের কোনো ওষুধ এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত, বলা ভালো যে অণুজীবের জন্মের কার্যকারণ এবং তার স্বভাবচরিত্র এখনও অবধি বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে না তার মারাত্মক সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রাথমিক পর্যায়ে অন্য কোনো উপায় ছিল না। অন্যান্য দেশেও এই পদ্ধতির প্রয়োগে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ভারতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটলো চার দিন পরে আঠাশে মার্চ, ২০২০। জাতীয় বিপর্যয়ের মোকাবিলায় অর্থ সংগ্রহের জন্য গড়ে তোলা হল এক বিশেষ তহবিল। পিএম কেয়ার্স ফান্ড। এই তহবিল পরিচালনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অধ্যক্ষ করে যে অছিপরিষদ বা ট্রাস্ট তৈরি হল তার অন্যান্য সদস্যরা হলেন দেশের স্বরাষ্ট্র, অর্থ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত তিন মন্ত্রী। ট্রাস্টের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্তব্য, দায়বদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়ে কোনো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে কি? ট্রাস্টের ঠিকানা অপ্রকাশিত। যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে ট্রাস্ট এখনও পর্যন্ত পঞ্জিভুক্ত হয়েছে কি? সদ্যগঠিত ট্রাস্ট কি সরকারি উদ্যোগ? এইসব প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর জানিয়েছে যে এর সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। সবমিলিয়ে পিএম কেয়ার্স ফান্ডের কাজকর্ম সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ। অথচ সেই ফান্ডে দান করে আয়করের ছাড় পাওয়ার জন্য অবিরাম প্রচার শুরু হয়ে গেল। জন্মের প্রথম সপ্তাহেই প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা সেই অ্যাকাউন্টে জমা পড়ল। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বেতনের একটি অংশ সেখানে দানের জন্য 'উৎসাহ' দেওয়া হল। বেসরকারি কর্পোরেটের কর্তারা নিজেদের নিচুতলার কর্মীদের বেতন না দিয়ে সেই ট্রাস্টে কয়েকশো কোটি টাকা জমা দিলেন।

টাকাগুলো যাচ্ছে কোথায়? উত্তর মেলা অসম্ভব। বিধিসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝাই যাচ্ছে 'পিএম কেয়ার্স' একটি ব্যক্তিগত ট্রাস্ট, সরকারি অডিটর যার হিসেব নিরীক্ষণ করতে পারবে না। এই অনৈতিক কাজটা এমন খোলাখুলি ঘটল যে তাক লেগে যায়। ভয়ঙ্কর সংকটের দিনে অন্য রাষ্ট্রপ্রধানরা যখন মানুষের কাছে কখনো মিনতি করছেন, ইতস্তত করছেন, তখন ভারত সরকারের তরফে এমন একটা অত্যন্ত আপত্তিকর ও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এ যেন সেই প্রাচীন গোলকধাঁধা। আসছে কিন্তু যাচ্ছে না। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাঁরা চিন্তিত, তাঁরা নিশ্চয়ই এই ভেবে স্বস্তি পেতে পারেন না যে পিএম কেয়ার্স-এর টাকা উপার্জন ও খরচের বিষয়ে যথেষ্ট স্বচ্ছতা রয়েছে। তাঁরা বরং বিপন্ন বোধ করবেন এই ভেবে যে, নাগরিকের দৃষ্টির অন্তরালে এই টাকা হয়তো ব্যয় হবে বিপজ্জনক কোনো কাজে, উৎকোচ দিতে, কিংবা জনপ্রতিনিধিদের কিনে নিতে।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর জানিয়েছে, ৩,১০০ কোটি টাকা এখনও অবধি পিএম কেয়ার্স থেকে বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে খরচ হয়েছে। কিন্তু, কত জমা পড়েছিল তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে যে দপ্তর আগেই জানিয়েছে যে এই তহবিলের সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে সেই দপ্তরই খরচের হিসেব দিচ্ছে কেন? তাহলে কি এই তহবিলের টাকার উপর সরকারি নজরদারির অভাব পূরণ করতে হবে অছিপরিষদের অধ্যক্ষের মুখের কথায় যার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক প্রশ্ন উঠেছে।

১৯৪৮-এর জানুয়ারিতে গঠিত প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল কিন্তু এখনও সক্রিয়। সরকারের তরফে সেই তহবিলে টাকা দানের কোনো আবেদন প্রচার করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত কর্মচারীকে প্রতি মাসে একদিনের বেতন পিএম কেয়ার্স ফান্ডে দান সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রকের যে নির্দেশ জারি করা

হয়েছিল তার তোয়াক্কা না করে সেনাবাহিনীর তরফে একদিনের বেতন সম্মিলিতভাবে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিলে দান করা হয়েছে। এপ্রিল মাসের বেতন থেকে এই দান সংগৃহীত হয়েছিল। বিষয়টি প্রচারের আলোয় আলোকিত না হলেও এর ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো কর্মীর মে মাসের বেতন থেকে কিন্তু একদিনের বেতন কাটা হয়নি। অথচ নির্দেশ ছিল ২০২১-এর মার্চ পর্যন্ত বেতন কাটার প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকবে।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের জাতীয় অবরোধের মরশুমে ভারতবর্ষ বোধ হয় অন্যতম ব্যতিক্রমী দেশ যেখানে বিপন্ন দেশবাসীর সংকট নিরসনে রাষ্ট্র সহযোগিতা করতে রাজি নয়। যে দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর প্রায় সবটুকু বেসরকারি সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার পর্যন্ত করোনা প্রতিরোধে জনপিছু ২,০০০ ডলার সাহায্য করেছে, গরিবদের পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য 'সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম'-এর সুবিধা দিয়েছে, ক্ষুদ্র ব্যবসায় জরুরি ভিত্তিতে ঋণদানের সুযোগ করেছে। এ সব তো 'ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম' বা ইউবিআই-এরই একটা অন্য সরস্করণ। অবিশ্যি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বছর না হলে বিষয়টি কী দাঁড়াত কে জানে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়মিত ঘণ্টা-পিছু কর্মীদের সবেতন 'সিক লিভ' দেওয়ার ঘোষণা করেছে বিভিন্ন সংস্থা। দীর্ঘ দিন ধরে সামাজিক সুরক্ষা কাটছাঁট করতে চাওয়া সত্ত্বেও আজ স্বাস্থ্যবিমার আওতার বাইরের লোকদের বিনা খরচে করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা এবং চিকিৎসার পক্ষে দাবি উঠেছে।

কানাডার সরকার প্রথমেই করোনা মোকাবিলায় ১০৭ বিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার ঘোষণা করেছিল, যা কানাডার জিডিপি-র ৩ শতাংশের থেকে বেশি। কর্মীদের এবং ব্যাবসাকে সরাসরি সহায়তা ছাড়াও করোনার প্রভাবে চাকরি যাওয়া রুখতে কর্মীদের বেতনের ১০ শতাংশ জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে ফরাসি সরকার। কর্মীদের চাকরি যাওয়া আটকাতে সর্বাধিক ২,৫০০ পাউন্ড পর্যন্ত প্রত্যেকের বেতনের ৮০ শতাংশ দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে ডেনমার্কের কোনো কোম্পানির ৩০ শতাংশ অথবা ৫০ জন কর্মী ছাঁটাইয়ের অবস্থা হলে তিন মাস তাদের বেতনের ৭৫ শতাংশ সরকারই জোগাবে। অস্ট্রেলিয়ার সরকার প্রায় ৭ লক্ষ ছোটো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ৭৮ লক্ষ কর্মীর সুরক্ষায় দিয়েছে ৬.৭ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনে 'সীমাহীন' ঋণদানের ঘোষণা করেছে জার্মানি। সামাজিক সুরক্ষায় ২০০ বিলিয়ন ইউরোর প্যাকেজ ঘোষণা করেছে স্পেন, যা তাদের জিডিপি-র প্রায় একপঞ্চমাংশ। অনেকটা ইটালি আর ফ্রান্সের ধাঁচে। সামাজিক নিরাপত্তা হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকার রক্ষাকবচ। ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানি ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জোগাচ্ছে ঋণ। ছাত্রঋণ শোধ আর ট্যাক্স জমা দেওয়ার সময়সীমা প্রায় সবদেশেই বাড়ানো হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ত্রাণ ব্যবস্থা মনে হলেও প্রতিটি দেশই কিন্তু বাস্তবে সমাজতন্ত্রের অনুসারী নয়।

ভারতের চিত্র কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। আইনি বাধ্যবাধকতায় বিনামূল্যে খাদ্যশস্য, ভর্তুকিযুক্ত খাবার, বিনাপয়সার রেশন, স্বাস্থ্যকর্মীদের বিমা ইত্যাদি চালু করলেও মহামারীর দাপটে কাজছাড়া-কাজহারা মানুষের জন্য রাষ্ট্র তেমন কিছুই করতে চায়নি। মে মাসের শেষ সপ্তাহে পাঁচ দফায় যে ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে ত্রাণ বা অনুদান প্রদানের কোনো বিষয় নেই। বিভিন্ন পর্যায়ের ঋণ সংক্রান্ত প্রকল্প রচিত হয়েছে। আর দেখানো হয়েছে এই ঋণের অর্থ জোগানোর জন্য রাজকোষে হাত দেওয়া হবে না। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিভিন্ন সংস্থার বি-রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের বন্দোবস্ত করা হবে। নীতিনির্ধারকরা কি ভেবে দেখেছেন যে বি-রাষ্ট্রীয়করণের আহ্বানে কেউ সাড়া না দিলে টাকা কে জোগাবে?

সর্বব্যাপী সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যব্যবস্থার জীর্ণ স্বাস্থ্য ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। আর সেই সুবাদে শুরু হয়েছে দেদার লুট। ভেঙে পড়া অথবা যথাযথভাবে গড়ে না ওঠা সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আপৎকালীন ভিত্তিতে জোড়াতালি মেরে কোনোরকমে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিয়মকানুন উপেক্ষা করে বাজার দরের থেকে অনেক বেশি দামে একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম কেনাকাটার ধুম লেগেছে। এই পরিসরে বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা চালিয়ে যাচ্ছে অমানবিক অত্যাচার। যথার্থ চিকিৎসার বদলে রোগীকে আর্থিকভাবে নিংড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দেওয়ার প্রক্রিয়া জারি করে চলছে দেদার ব্যবসা। রাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ স্থাপনের আগে প্রায় প্রতিটি বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে সরকারের কাছ থেকে নানারকম সুযোগ সুবিধা নিয়েছে। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং প্রতিহত করার নামে জনজীবন বিপর্যস্ত করে দেওয়ার সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় মানুষ আজ দিশেহারা। সামাজিক নিরাপত্তার বদলে সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টির সার্থকতা প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার সুবাদে শুরু হয়ে গেছে অবাধ লুণ্ঠন। সামাজিক সন্ত্রাসকে কাজে লাগিয়ে পিএম কেয়ার্স ফান্ডে নির্বিবাদে অর্থ সংগ্রহ চলছে। সন্ত্রস্ত জনজীবনের প্রতিবাদ সম্মিলিতভাবে সোচ্চার হতে পারছে না বলেই সংক্রমণ নিয়ে চলছে অবাধ লুটপাট। তবে ইতিহাসের শিক্ষা, কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষ নয়, বিপর্যস্ত সমাজসভ্যতার পুনর্নির্মাণ করে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা।

সমসাময়িক

প্রেস সাপ্রেস তথ্য সাম্রাজ্যবাদ

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রাথমিক লুকিয়ে আছে ব্যবসায়িক না হওয়ার মধ্যে— কার্ল মার্কস, *সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক*।

আমার হাত ও পা স্বাধীনভাবে কাজ করছে, কিন্তু মাথার কাজ বন্ধক দেওয়া আছে। অবশ্যই আরো বুদ্ধিমানের কাছে— কার্ল মার্কস, *সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক*।

১.

লকডাউন মানে সবার লোকসান! আমার একার না। ভুল ভাবছেন। আমেরিকার ১০টি সংস্থা শত শত বিলিয়ন ডলারের ব্যাবসা করেছে। আমেরিকা তো আপনার কী? ভারতের খবর শুনুন। আদানি আম্বানির লাভ বেড়েছে। মুদির দোকান খোলা ছিল কেন? আদানির মাল বেচেছে সরষের তেল থেকে চপ পকোড়ার বেসন পর্যন্ত।

আর তাদের প্রমোটার সংস্থা বিজেপি-র আয় হয়েছে, অফিসিয়ালি ২০৪২ কোটি টাকা।

আরে, আপনি এসব খবর জানেন না।

জানেন না কেন?

ঘটেনি বলে? না আপনাকে জানতে দেওয়া হয়নি বলে।

২.

ভারতের একটি 'গল্প' শোনানো যাক। বোফর্স কেলঙ্কারি নিয়ে সারা ভারত তোলপাড়। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ অরুণ শৌরি, 'দি হিন্দু'-র এন রাম দেশ কাঁপাচ্ছেন এবং সুইডেন থেকে চিত্রা সুব্রহ্মণিয়াম আগুন ঝরানো প্রতিবেদন পাঠাচ্ছেন। একদিন চিত্রার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়নি বা ভেতরের পাতায় চলে যায়। এতে রেগে অগ্নিশর্মা এন রাম 'দি হিন্দু'-র মালিক নিজের কাকার ঘরে দরজা ঠেলে ঢুকে যান।

কেন এটা ঘটল?

ভাইপো যত উত্তেজিত, কাকা তত শান্ত।

শোন, রাম, হিন্দু 'দি হিন্দু' হয়েছে খবর ছেপে নয়, না ছেপে। এত যদি বিপন্ন করার শখ নিজের পত্রিকা করো।

তারপরই এন রামের 'ফ্রন্টলাইন' পাক্ষিকে মনোযোগ।

এটি হয়তো নিছক গল্প, তবে, কলকাতার এক তরুণ সাংবাদিককে এন রাম শুনিয়েছিলেন, 'স্টেটসম্যান'-এর এক আবাসিক সম্পাদকের ঘটনা। বিশ শতকের নয়ের দশকে ওই আবাসিক সম্পাদক মুম্বাই যান কভার করতে। ব্যাবসা জগতের খবরাখবর। সেখানে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর আধিকারিক, তাঁকে বলেন, 'আমরা সাধারণত, ... হাজার টাকা দিই, আপনি যদি এর চেয়ে বেশি চান বলবেন। অসুবিধা হবে না।' টাকাটা ছিল, তাঁর মাসিক বেতনের পাঁচগুণ। শুনে সৎ সেই সাংবাদিক থ।

এন রাম বলেন, পেড নিউজ এভাবেই চলে ব্যাবসাক্ষেত্রে। এখন এটা রাজনীতিতে সমান সত্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নিয়ে গবেষণাকারী আরিল এঙ্গেলসন রুড একটা নিবন্ধে বলেন, রাজনীতি বাংলাদেশে একটা বড়ো ব্যাবসা। ভারতেও এটা সমান সত্য। পেড নিউজ এখন জলভাত। পুরো প্রচার মাধ্যম কিনে ফেলা গেছে। শুধু আম্বানি একা ভারতের প্রধান ৩৬টি সংবাদ মাধ্যমের মালিক। ভারতের নতুন মিডিয়া মুঘল, নতুন রুপার্ট মার্ডক মুকেশ আম্বানি। রিপাবলিক টিভির মালিক বিজেপি-র নেতা। জি নিউজ নেট ওয়ার্কের মালিক বিজেপি-র সাংসদ।

আপনি স্বাধীন নন। আপনার পছন্দের চ্যানেল একটি বা দুটি। তাও আম জনতার কাছে তা ভাষার ব্যবধানে দূরদ্বীপবাসী।

৩.

সাংবাদিকের স্বাধীনতা অর্থনৈতিক যাঁতাকলে বন্দি। দু-একজন ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু মালিকের নীতির বিরোধী হলে ছাঁটাই। পুণ্যপ্রসূন বাজপেয়ি, বিনোদ দুয়ার মতো সাংবাদিকের চাকরি গেছে। তাঁরা স্বাধীন মত প্রকাশ বন্ধ করেননি। ফলে এ রাজ্যে সে রাজ্যে মিথ্যা মামলা। খুন হয়েছেন গত ছয় বছরে ৪৫ জন সাংবাদিক। কাশ্মীরে কত সাংবাদিক বন্দি তা কেউ জানেন না। কাশ্মীরে ৫৩ পাতার নিয়মাবলী প্রকাশ করা হয়েছে। শেকল পরানো সম্পূর্ণ করবে বলে। আন্তর্জাল সুবিধা নেই ১০ মাসের বেশি। ফোন মোবাইল নেই। ভাবা যায়।

তার চেয়েও বড়ো বিপদ ভারতের সংবাদ মাধ্যমে সে নিয়ে উচ্চবাচ্য নেই।

যেন কোথাও কিছু ঘটেনি। সর্বত্র শান্তি, শান্তি ফিল গুড ভাব।

শুধু কিছু জঙ্গি মৃত্যুর খবর ছাপা হয়। ৮০ লক্ষের রাজ্যে ১০ লক্ষ সৈন্য। জঙ্গি আসে কোন পথে? কীভাবে? কারা অস্ত্র দেয়? আদৌ অস্ত্র ছিল কি না? কে প্রশ্ন করবে?

সুপ্রিম কোর্ট কাশ্মীর নিয়ে সেভাবে মামলা পর্যন্ত শোনেনি।

৪.

কেউ কি কিছু শুনতে চান?

রাজ্যসভায় ২০১৯-এর ৫ আগস্ট দেশের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ হুঙ্কার দিলেন, পাক অধিকৃত কাশ্মীর আমাদের, আকসাই চিন আমাদের। শুরু হয়ে গেল রাস্তা নির্মাণ। আর এর জবাবে ডোকলামে, অরুণাচল প্রদেশে আর যে লাদাখকে ভালোভাবে ভারতীয় করা যাবে আলাদা অঞ্চল করে কেন্দ্রীয় শাসন চালু করা হল, সেখানে গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে ঢুকে পড়ল চিনা সেনা। গালওয়ান উপত্যকায়। লাদাখে একটি পার্বত্য উন্নয়ন পর্ষদ আছে। তার সদস্য সালাতিয়াজ গোরাবো বলছেন, গত বছর সেপ্টেম্বরেই ঢুকেছে চিনা সেনা। চিনা সৈন্য আরো অন্য এলাকায় ঢুকেছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় ৮টি গ্রাম আছে। পার্বত্য উন্নয়ন পর্ষদের আরেক সদস্য বলছেন, তাঁরা প্রশাসন সেনা পুলিশ সবাইকে বলেছেন চিনা অভিযান নিয়ে, কেউ কর্ণপাত করেননি। কারণ বর্তমানে দেশে কথা চলে মাত্র দু-জন লোকের। তাদের ইচ্ছায় কর্ম।

তাদের ইচ্ছা কী বুঝলেও বলার হিম্মত খুব কম জনের আছে। 'দ্য প্রিন্ট' ২৮ মে চিনা সৈন্যের ভারতে ঢোকা নিয়ে খবর করে। ২৯ মে রাহুল গান্ধী টুইট করেন। ফেসবুকে মে মাস থেকেই লেখালেখি চলছে। ১৯৯৯-এ কার্গিল যুদ্ধের সময়ও পাক সেনাদের ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। এবারও যেন তাই। কিন্তু তেমন প্রশ্ন নাই।

৫.

প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য আলাদা। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, অনুপ্রবেশ হয়নি। বিদেশমন্ত্রী বলেছেন হয়েছে। অন্য দেশ হলে সংবাদমাধ্যম ছিঁড়ে খেত। এখানে কাত হয়ে পড়ে আছে। ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে গণহত্যা হল। যারা করল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নাই। যাঁরা ত্রাণ দিলেন তাঁদের অনেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হর্ষ মান্দারের নামে মামলা, যোগেন্দ্র যাদবের নামে মামলা, কনস্টেবল খুনের মামলা।

যে কনস্টেবলের ভাই বলেছিলেন, দাদার শেষ ফোনে তিনি শুনেছেন, জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে তাঁকে। সংবাদমাধ্যম বোবা কালা কুম্ভকর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

৬.

পরাধীন বা স্বাধীন দেশে প্রথম ডিজেলের দাম পেট্রোলের চেয়ে বেশি। পে রোলে থাকা সংবাদমাধ্যম নীরব। নেপাল গুলি করে মেরে ফেলেছে এক ভারতীয়কে। স্বাধীনতার পর প্রথম। মিডিয়া প্রশ্ন করতে ভুলে গেছে। ভুটান আসামের চাষের জল দেবে না। নদীপথ পালটে ফেলেছে। দেখবেন না সেভাবে হইচই। আমাদের সব দেশপ্রেম মুসলিম প্রশ্ন ঘিরে। এটা পাকিস্তান বা বাংলাদেশ হলে কুকুরের বক্লেস খুলে এরাই সিংহনাদ করত, শিবারবে দায় হত কান পাতা।

৭.

তবে এইসব ঢাকতে, শ্রমিকের কৃষকের বেকারের কান্না ঢাকতে জাল সংবাদের রমরমা। হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটির কাজ করে দিচ্ছে টিভি, খবরের কাগজ। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেছেন, জনগণের জিভ কেটে ফেলছে সরকার। আর মিডিয়া নিজেদের আঙুল কেটে ফেলেছে একলব্যের মতো, জিভে ছুরি বিঁধিয়ে ফেলেছে।

৮.

লকডাউনের ফলে সর্বত্র মন্দা। সংবাদমাধ্যম কার্যত সরকারি বিজ্ঞাপন নির্ভর। এ অবস্থায় দ্য হিন্দু, দ্য টেলিগ্রাফ কিছুটা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে। স্ক্রল, প্রিন্ট, ক্যারাভ্যান— রেখে চলেছে সংবাদ শব্দের মানে। আমাদেরও দায় আছে তাদের বাঁচিয়ে রাখার।

নইলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না।

লকডাউন ও কোভিড সংক্রমণ: তথ্য কী বলছে?

ইন্দ্রনীল চৌধুরী

কোভিড অতিমারির বিরুদ্ধে লড়ছে গোটা বিশ্ব। আমাদের দেশেও এই রোগের প্রকোপে বহু মানুষ মৃত, বেড়ে চলেছে রোগীর সংখ্যা। তবু, দেশের প্রধানমন্ত্রী দাবি করছেন যে ভারত নাকি কোভিড মোকাবিলায় গোটা বিশ্বের সামনে নজির সৃষ্টি করেছে। প্রায় তিন মাস ধরে লকডাউন চলল। কিন্তু কোভিডের প্রকোপ কমল কি? প্রধানমন্ত্রীর কথাই কি সত্যি? ভারত কি কোভিড মোকাবিলায় নজির স্থাপন করেছে? প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধান করার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

লকডাউনের আগে

প্রথমেই দেখে নেওয়া দরকার ভারতে করোনা সংক্রমণের একটি সংক্ষিপ্ত দিনলিপি। ভারতে প্রথম কোভিড রোগীর সন্ধান মেলে কেরালার ত্রিসুর শহরে এই বছরের জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখে। এই রোগী চিনের উহানে ডাক্তারির ছাত্রী, যিনি সেখানে মহামারি শুরু হওয়ার পরে দেশে ফেরেন। ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তারিখে তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। ৪ মার্চ অবধি ভারতে ২৮ জন কোভিড আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে ২৫ জনকে সনাক্ত করা হয় ১ থেকে ৪ মার্চের মধ্যে। এই ২৫ জনের মধ্যে ১৬ জন ইতালীয় পর্যটক ছিলেন।

১৩ মার্চ সনাক্ত কোভিড রুগীর সংখ্যা হয় ৮১। এই সময় পিটিআই সূত্রের খবর অনুযায়ী কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা করোনা ভাইরাসকে কোনো স্বাস্থ্য সংকট হিসেবে দেখেননি। মেজাজ বদলায় মার্চ মাসের ২০ তারিখ। এই দিন প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন, অতিমারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য দেশের মানুষকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে আহ্বান করেন এবং ২২ মার্চ 'জনতা কার্ফু'-র ঘোষণা করেন। ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী আবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন সন্ধে ৮টায়। এই ভাষণে তিনি ২১ দিনের জন্য দেশ বন্ধ বা লকডাউনের ঘোষণা করেন চার ঘণ্টার নোটিশে। তিনি দাবি করেন করোনা অতিমারিকে ঠেকাতে এবং সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙতে এই লকডাউনের কোনো বিকল্প নেই। অর্থাৎ, মাত্র ১২ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার করোনা কোনো স্বাস্থ্য সংকট নয়, এই অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে দেশে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করে।

লকডাউন ও কোভিড সংক্রমণ

মনে করা হয়েছিল, লকডাউনের মধ্যে কোভিড সংক্রমণের সংখ্যা খুব বেশি বাড়বে না। কিন্তু তথ্য কী বলছে? লকডাউনের প্রথম দিন, গোটা দেশে সনাক্তকৃত কোভিড রোগীর সংখ্যা ছিল মোট ৫৬২, মৃত্যু হয়েছিল মোট ৯ জনের। লকডাউনের প্রথম পর্যায়ের শেষে সনাক্তকৃত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয় ১১০০০-এর বেশি এবং একদিনে সংক্রমিত হন ১০৭৬ মানুষ। ইতিমধ্যেই ৩০০ জনের বেশি মানুষের এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় (সারণি ১ দেখুন)। প্রথম পর্যায়ের পরে লকডাউনের মেয়াদ আরো তিনটি পর্যায়ে বাড়ানো হয়, যদিও বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করে। কিন্তু দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যার বৃদ্ধিতে কোনো হ্রাস দেখা যায়নি। তৃতীয়, চতুর্থ পর্যায়ের লকডাউন এবং 'আনলক ১'-এর পর্যায়ে দৈনিক সংক্রমিতের সংখ্যা ছিল, যথাক্রমে ২৫৫৩, ৫২৪২, ৮৩৯২। মোট সনাক্তকৃত সংক্রমণের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। বর্তমানে, (২১ জুন) ভারতে মোট সংক্রমিতের সংখ্যা ৪১০৪৬১ জন, মৃত ১৩২৫৪। পাঠকের হাতে এই প্রবন্ধ পৌঁছোতে পৌঁছোতে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা আরো বাড়বে।

মোট সংক্রমণের নিরিখে ভারতের স্থান সমস্ত দেশের মধ্যে এখন চতুর্থ— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল এবং রাশিয়ার পরেই (চিত্র ১ দেখুন)। লকডাউনের শুরুতে, অর্থাৎ ২৫ মার্চ, ভারতের স্থান ছিল সংক্রমণের নিরিখে ৩৯তম। ১৫ এপ্রিল, ৪ মে, ১৮ মে এবং জুন ১ তারিখে অর্থাৎ লকডাউনের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম পর্যায়ের শুরুতে, ভারতের স্থান ছিল

সারণি ১: ভারতে লকডাউনের বিভিন্ন পর্যায়ে কোভিড-১৯ সংক্রমণের সংখ্যা

Lockdown phases	Lockdown periods	Date	Daily Cases	Total Confirmed Cases	Cases Recovered	Total Deaths	Daily Deaths
Phase 1 (21 days)	25 March - 14 April	25-Mar	70	562	156	9	0
Phase 2 (19 days)	15 April - 3 May	15-Apr	1,076	11,439	1,305	377	38
Phase 3 (14 days)	4 May - 17 May	04-May	2,553	42,533	11,706	1,373	72
Phase 4 (14 days)	18 May - 31 May	18-May	5,242	96,169	36,824	3,029	157
Unlock 1.0	1 June - 15 June ongoing (till 30 June)	01-Jun	8,392	190,535	91,819	5,394	230
		21-Jun	15,413	410,461	227,756	13,254	306

Table: by Indranil Chowdhury • Source: MoHFW, GoI, & ourworldindata.org • Created with Datawrapper

মোট সংক্রমণের নিরিখে ২০, ১৩, ১০ এবং ৬ নম্বরে (সারণি ২ দেখুন)। অর্থাৎ, লকডাউন বজায় থাকার সময় ভারতে কোভিড সংক্রমণের সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় দ্রুত হারে বাড়তে থাকে।

লকডাউন ও কোভিড সংক্রমণ: ভারত ও অন্যান্য দেশ

অথচ, লকডাউন এবং সংক্রমণের সংখ্যার নিরিখে অন্যান্য সব দেশের অভিজ্ঞতা ভারতের মতন হতাশাব্যঞ্জক নয়। কোভিড নিয়ন্ত্রণে ভারতের ব্যর্থতা প্রকট হয় যদি আমরা ভারতের সঙ্গে বিশ্বের আরো পাঁচটি কোভিড আক্রান্ত দেশের চিত্রের তুলনা করি যেখানে দৈনিক সনাক্তকৃত কোভিড রুগীর সংখ্যা দেখানো হয়েছে। যদি কোনো দেশ কোভিড নিয়ন্ত্রণে সফল হয়, বা যাকে বলা হয় 'Flatten the Curve' করতে পারে, তবে রেখাচিত্রটি একটি ঘণ্টা (bell shape)-এর মতন দেখতে হবে, যেখানে সংক্রমণের সংখ্যা প্রথমে দ্রুত হারে বেড়ে একটি অধিকতম বিন্দু স্পর্শ করে আবার কমবে। ইতালি ও ব্রিটেনের

চিত্র ১: কোভিড ১৯ সংক্রমণের নিরিখে প্রথম চার দেশ

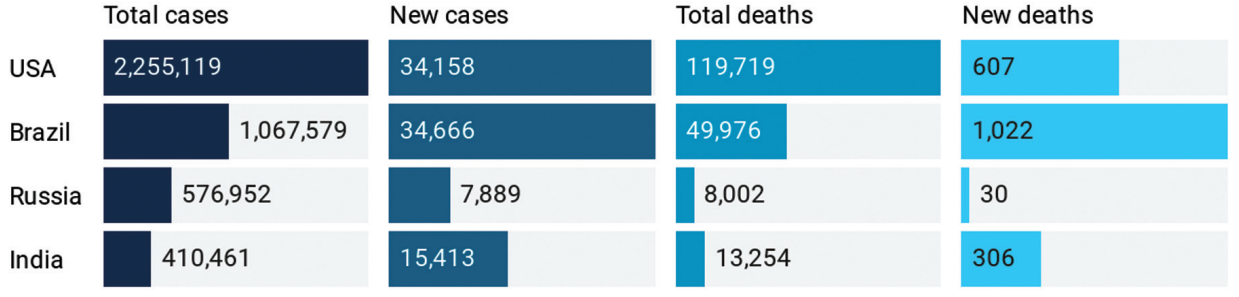

on 21 June

Chart: by Indranil Chowdhury • Source: ourworldindata.org • Created with Datawrapper

সারণি ২: মোট সংক্রমণের নিরিখে ভারতের অবস্থান

Date	Total Confirmed Cases	Position in world
25-Mar	562	39
15-Apr	11,439	20
04-May	42,533	13
18-May	96,169	10
01-Jun	190,535	6
21-Jun	410,461	4

Author's compilation

Table: by Indranil Chowdhury • Source: MoHFW, GoI & ourworldindata.org • Created with Datawrapper

(UK) ক্ষেত্রে নতুন রুগীর সংখ্যা অনেকটাই কমেছে। রাশিয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা কমেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমেও আবার ইদানিং বাড়তে শুরু করেছে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বের কঠিনতম লকডাউন ঘোষণা করার পরেও, দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ব্রাজিলেও অনুরূপ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। চিত্র ২ থেকে স্পষ্ট কিছু দেশের ক্ষেত্রে curve

চিত্র ২: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দৈনিক কোভিড সংক্রমণ

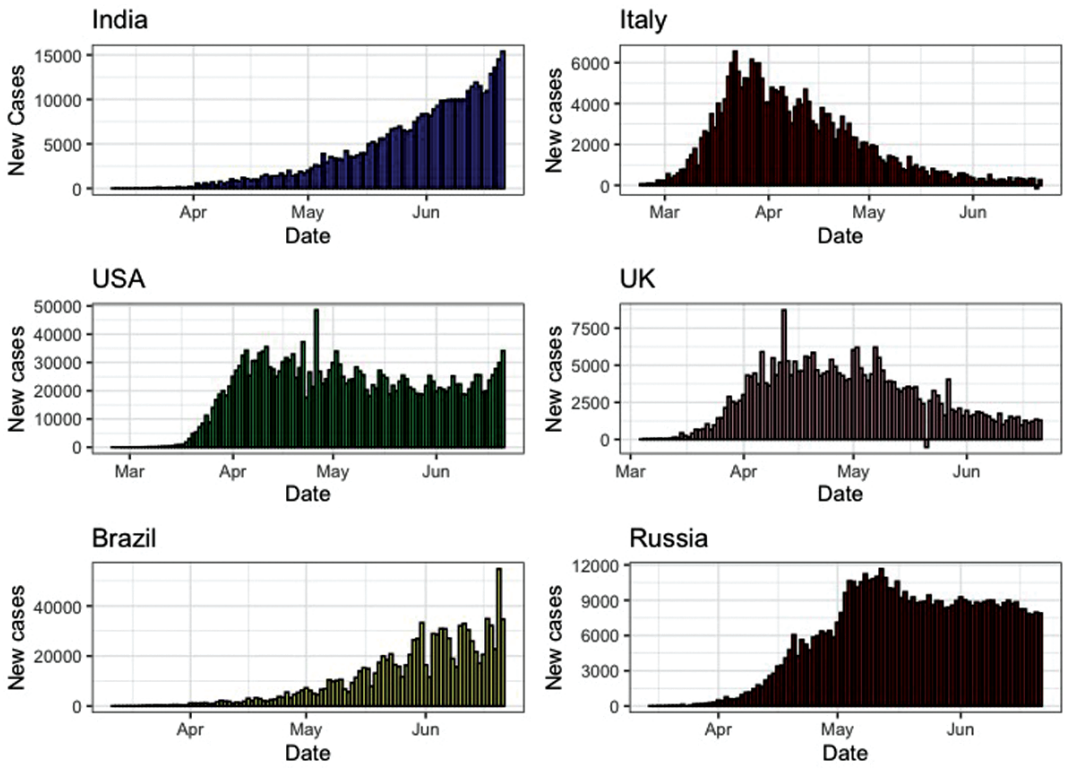

flatten হয়েছে, বা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তা হয়নি। বর্তমানে নতুন সনাক্তকৃত দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে ভারত তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এই প্রবণতার যদি পরিবর্তন না হয়, ভারত অচিরে পৃথিবীতে সর্বাধিক কোভিড সংক্রমিতের দেশের স্থান দখল করতে পারে।

সরকারের তরফে অনেক সময় বলা হচ্ছে যে জনসংখ্যার নিরিখে কোভিডে মৃতের সংখ্যা বিচার করলে, ভারত যথেষ্ট ভালো অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু ভারতে কোভিড নাট্যে এখনও যবনিকা পতন হয়নি। আমরা আগেই দেখেছি যে ভারত মোট সংক্রমণের সংখ্যাকে কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই এই বিবর্তমান পরিস্থিতিতে জনসংখ্যার অনুপাতে মৃতের সংখ্যার বিচার করা যথাযথ হবে না। এমন হতেই পারে যে মৃতের সংখ্যা আগামীদিনে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাবে। চিত্র ৩-এ কোভিড আক্রান্তের নিরিখে প্রথম চার দেশের দৈনিক মৃতের সংখ্যা (তিনদিনের গড়) দেখানো হয়েছে। লাল রেখাটি ভারতের। চিত্র ৩ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রত্যেকদিন ভারতে মৃতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের মতন বিপুল জনসংখ্যার দেশে মোট মৃতের সংখ্যা ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছোতে পারে যদি না অতিমারিকে দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

একটি নিবন্ধে সমাজবিজ্ঞানী পার্থ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে যদিও ভারতে সনাক্তকৃত সংক্রমণের নিরিখে মৃত্যুর হার কম, কিন্তু তা সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরছে না। তিনি বলেছেন ভারতে অল্প বয়স্ক মানুষের সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। তাই আপাতদৃষ্টিতে মোট সংক্রমণের নিরিখে মৃতের অনুপাত কম। কিন্তু বয়স অনুযায়ী আমরা যদি সংক্রমণের নিরিখে মৃতের হারের দিকে তাকাই তবে দেখা যাবে যে মৃত্যুর হার ইতালির থেকেও বেশি। যেমন মহারাষ্টের ক্ষেত্রে শ্রীমুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন ৬০ বছরের নিচে যাদের বয়স তাদের মৃত্যুর হার ইতালির চার গুণ। তুলনামূলকভাবে অল্পবয়স্কদের মধ্যে এত বেশি মৃত্যুর হার খুবই চিন্তার বিষয়।

চিত্র ৩: বিভিন্ন দেশে দৈনিক মৃতের সংখ্যা (তিনদিনের গড়)

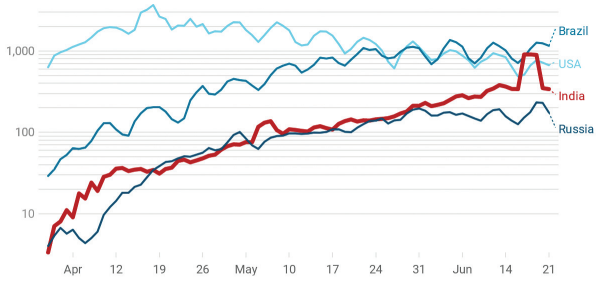

y-axis log scale

Chart: by Indranil Chowdhury • Source: My calculations, & ourworldindata.org • Created with Datawrapper

কোভিড পরীক্ষা

উপরের আলোচনা করা হয়েছে মোট সনাক্তকৃত কোভিড আক্রান্তের হিসেবের ভিত্তিতে। কিন্তু একজন তখনই কোভিড আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত হবেন যখন তাঁর পরীক্ষা হবে। তাই বিভিন্ন দেশে কত কোভিড পরীক্ষা হচ্ছে তার উপরে নির্ভর করছে চিহ্নিত কোভিড রোগীর সংখ্যা। আমরা ভারত এবং অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে কোভিড পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে কিছু আলাচনা করব। ব্রাজিল পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই আমরা এই দেশকে আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি। চিত্র ৪ থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি হাজার জনসংখ্যার নিরিখে ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরীক্ষা করা হচ্ছে না। এই হারের নিরিখে ভারতের স্থান দক্ষিণ এশিয়ার আমাদের প্রতিবেশীদের আশেপাশেই রয়েছে। বর্তমানে ভারতে দৈনিক পরীক্ষার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু তা এখনও উন্নত দেশের তুলনীয় নয়।

চিত্র ৪: বিভিন্ন দেশে কোভিড পরীক্ষা

	Total tests	New tests	Total tests per thousand	New tests per thousand
Russia	15,395,417	234,265	105.5	1.61
Italy	4,695,707	46,882	77.66	0.78
USA	24,449,307	464,715	73.86	1.4
UK	4,032,084	65,301	59.4	0.96
Turkey	2,721,003	46,800	32.26	0.56
Iran	1,293,609	24,415	15.4	0.29
India	5,921,069	146,936	4.29	0.11
Pakistan	922,665	25,015	4.18	0.11
Bangladesh	536,717	17,214	3.26	0.11

Data of 16 June

Chart: by Indranil Chowdhury • Source: ourworldindata.org • Created with Datawrapper

ভারতে পরীক্ষার পরিমাণ যে অপর্যাপ্ত তা অন্য একটি তথ্য থেকেও পরিষ্কার হয়। ১০০টি পরীক্ষা করা হলে তার মধ্যে কোভিড পজিটিভ কতজন, এই হারকে বলা হয় test positivity rate। ভারতে পরীক্ষার যে সংখ্যা প্রকাশিত হয় তা নমুনার সংখ্যা, ব্যক্তির নয়। এক ব্যক্তির একাধিকবার নমুনা পরীক্ষা হতে পারে। তাই এই ক্ষেত্রে আসল test positivity rate গণনাকৃত test positivity rate-এর তুলনায় বেশি হবে। চিত্র ৫-এ লাল রেখার মাধ্যমে দৈনিক test positivity rate দেখানো হয়েছে। চিত্র ৫ থেকে পরিষ্কার যে এপ্রিল মাসের শেষ থেকে এই হার লাগাতার বাড়ছে। এই প্রবণতা তখন সম্ভব যখন পরীক্ষার সংখ্যা পর্যাপ্ত নয় কিন্তু সংক্রমণের ব্যাপ্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়াকে ছাপিয়ে যায়। কোভিড সংক্রমিত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যাবে না যদি না তাদের পরীক্ষা করা হয়।

তাই সমাজে যদি প্রচুর কোভিড রোগী থাকে এবং পরীক্ষা কম হয়, তাহলে test positivity rate বেড়ে যাবে। যদি সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় তবে test positivity rate-এর রেখাচিত্রটি ইংরেজি U অক্ষরের উলটো আকার নেবে, অর্থাৎ, প্রথমে বেড়ে পরে কমে যাবে। ঘোষ ও কাদির (২০২০) তাদের গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন যে প্রারম্ভিক পর্যায়ে test positivity rate বাড়বে। কিন্তু যখন বেশি করে কোভিড সংক্রমিত ব্যক্তি চিহ্নিত করা হবে, তখন সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙবে এবং দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা কমে আসবে। চিত্র ৫ থেকে বোঝা যাচ্ছে ভারতের ক্ষেত্রে test positivity rate কমছে না, বরং এখনও বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ, ভারতে কোভিড সংক্রমিতের প্রকৃত সংখ্যা চিহ্নিত কোভিড আক্রান্তের থেকে অনেকটাই বেশি।

চিত্র ৫: ভারতে মোট পরীক্ষা এবং test positivity rate

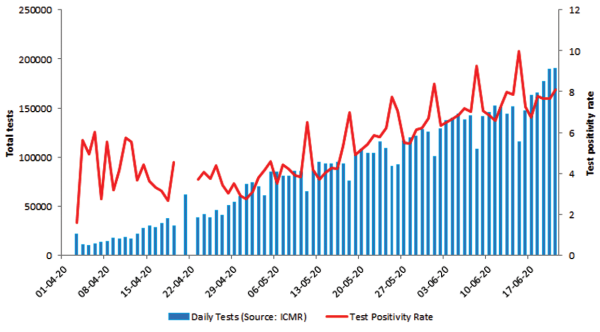

উপসংহার

চার ঘন্টার নোটিশে অপরিকল্পিত লকডাউনের অভিঘাতে অর্থব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে যা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। তদুপরি এ নিবন্ধে আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম যে কোভিড নিয়ন্ত্রণের যেই মূল লক্ষ্যে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। করোনা ভাইরাস ভারতে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং বিভিন্ন রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়ার উপান্তে এসে পৌঁছিয়েছে। সরকারের উচিত নিজেদের ভ্রান্ত দাবিগুলিকে সরিয়ে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে কোভিডের পরিস্থিতির বিবেচনা করে, পরীক্ষা আরো বাড়িয়ে, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বৃদ্ধি করে এই সংকটের মোকাবিলা করা। এখনই যদি উপযুক্ত পদক্ষেপ ঘোষণা না করা হয়, অনেক দেরি হয়ে যাবে।

সূত্র

Ghosh, S. M., & Qadeer, I. (2020). Significance of Testing for Identification of COVID-19: A State-level Analysis. *Economic & Political weekly, LV(20),* 12-15.

Mukhopadhyay, P. (2020, June 11). Is India's Covid-19 death rate higher than Italy? *Hindustan Times.* New Delhi, Delhi, India. Retrieved June 16, 2020, from hindustantimes.com : https://www.hindustantimes.com/opinion/is-india-s-covid-19-death-rate-higher-than-italy-s/stoiy-F73TUEHkNkDrgBT6WAeDEM.html

অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল থেকে

পরিবর্তনের ধারায় কিছু নূতনত্ব

অরুণ সোম

বিজয় দিবস: ৯ মে

মস্কো, ১২ মে ১৯৯২। ৯ মে বিজয় দিবস। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে পিতৃভূমির মহাযুদ্ধ নামে পরিচিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দু-কোটি সত্তর লক্ষ সোভিয়েত মানুষের প্রাণের বিনিময়ে (যার মধ্যে ৮৬ লক্ষ সোভিয়েত সৈনিক) অর্জিত এই বিজয়। বার্লিনে রাইখস্টাগের মাথায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয় কেতন তোলার পর অর্ধ-শতাব্দী পার হতে না হতে এই বিজয়ের স্বাদ অনেকের কাছে তিক্ত হয়ে উঠেছে।

তাই স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের স্মৃতিতে মামাইয়েভ টিলার ওপর রচিত বিশাল স্থাপত্য সমাহার সংস্কারের অভাবে বিনষ্টপ্রায় হতে চললেও, জননী রাশিয়ার আকাশছোঁয়া মূর্তির পায়ের তলার ভিতে ফাটল দেখা দিলেও তা নিয়ে বিশেষ কারো মাথাব্যথা দেখা যায় না। পেরেস্ত্রৈকার আমলের ঐতিহাসিকরা নতুন করে লিখতে বসেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস। পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যম মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে গেরিলা যুদ্ধের বীরদের কৃতিত্বকে। এমন তত্ত্বও খাড়া করা হচ্ছে যে, যুদ্ধ এড়ানো যেত, এড়ানো যেত এত লোকের প্রাণক্ষয়। শোনা যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নে যুদ্ধের পর শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগসাজশের সন্দেহে আরো দু-কোটি মানুষকে হত্যার বীভৎস কাহিনি। অনেক ঐতিহাসিক আবার ওই দুই কোটি সত্তর লক্ষের মধ্যে কুড়ি লক্ষ স্তালিনের নিধনযজ্ঞের শিকার বলেও মনে করেন।

এবারে রেড স্কোয়ারে ঐতিহ্যবাহী সামরিক কুচকাওয়াজের জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় Renteck International Ltd. সংগঠিত শান্তির জয় নামে একটি ছোটোখাটো প্যারেড। তিনশো জন প্রবীণ যোদ্ধা, নাৎসি বন্দি শিবিরে নির্যাতিত এবং বিদেশি অতিথিরা তাতে যোগ দেন। ক্রেমলিন প্রাসাদে চিরাচরিত ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের জায়গায় পরিবেশিত হয় Rock Impressario-র পরিচালনায় বিচিত্রানুষ্ঠান।

দিনটা একেবারে শান্তিপূর্ণ ছিল না। গত বছরের আগস্ট মাসে সরকার-বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তির দাবিতে সরকারবিরোধীরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। অভিনন্দন জানানো হয় উক্ত অভিযোগে ধৃত জেনারেলদের। বিশেষত বিজয় দিবস উপলক্ষে অনেকে এক লাখ রুবেলের জামিনে মুক্তির দাবি তুলেছিলেন জেনারেল ভারেন্নিকভের। সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাবপ্রাপ্ত এই জেনারেল ছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সৈনিক, রেড স্কোয়ারে ঐতিহাসিক বিজয়ের কুচকাওয়াজের একজন অংশগ্রহণকারী। চের্নোবিল দুর্ঘটনার সময় দুর্গতদের সাহায্যের জন্য প্রথম যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন।

কিন্তু ফিরে আসা যাক বর্তমানে। বিজয় দিবসের আগে ৭ মে এক নির্দেশবলে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন রুশ ফেডারেশনের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করলেন নিজেকে— বলাই বাহুল্য, রুশ ফেডারেশনের সংবিধান মতে, সম্পূর্ণ বিধিসম্মত উপায়ে। এখন থেকে যিনি প্রেসিডেন্ট তিনিই সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, আবার তিনিই প্রতিরক্ষামন্ত্রী— একাধারে ত্রিমূর্তি। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ককে নির্দেশ দেবেন। আবার সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি নির্দেশ দেবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে। শুধু একটু খুঁত রয়ে গেল— উপযুক্ত কোনো সামরিক খেতাব সর্বাধিনায়কের নেই। বিজয় দিবস উপলক্ষে সেরকম খেতাব প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করলে কিন্তু তাঁকে দিতে পারতেন।

শ্রমদান দিবস

মস্কো, ১২ মে ১৯৯২। লেনিনের জন্মদিবস উপলক্ষে প্রতি বছর ২২ এপ্রিল বা তার কাছাকাছি কোনো শনিবার দেশে যে শ্রমদান দিবস অনুষ্ঠিত হত, এবছর তা হল না। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রশ্নই ওঠে না। ওই দিনটি উপলক্ষে শহরের পাড়ায় পাড়ায় লোকজন বেরিয়ে পড়তেন জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজে। এ বছর অবাধ বাণিজ্যের দৌলতে মস্কোর মতো বড়ো বড়ো শহরের রাস্তা-ঘাটে জঞ্জাল স্তূপাকার হয়ে ওঠা সত্ত্বেও

সাফাইয়ের কোনো গরজ দেখা যাচ্ছে না পুরসভার দিক থেকে।

অবশ্য কমিউনিস্টরা পাছে ওই দিন শ্রমদান দিবসের নাম করে শহরের জঞ্জাল সাফাইয়ে নেমে পড়ে কৃতিত্ব নিয়ে ফেলে তাই মেয়রের অফিস রুশ পঞ্জিকা অনুযায়ী উদ্‌যাপিত ইস্টার উপলক্ষে জনসাধারণকে এই ১৯ তারিখেই (ভাগ্যিস একই সময়ে পড়েছিল) শ্রমদানের আবেদন জানায়। কিন্তু তাতে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি নাগরিকদের দিক থেকে। সকলেই যে যার পেটের চিন্তায় ব্যস্ত। ঠাট্টাচ্ছলে বাধ্যতামূলক শ্রমদান বলে যা পরিচিত ছিল জনসাধারণের জীবন থেকে তার অবসান ঘটলেও কমিউনিস্ট পার্টির নতুন দল ও উপদলগুলির মধ্যে সেই দিন উৎসাহের অভাব দেখা যায়নি। গণতন্ত্রীরা যখন তুঙ্গে, সেই পরিস্থিতিতে শহরের বিভিন্ন স্থানে জঞ্জাল সাফাই এবং লেনিন ও মার্কসের স্মৃতিমূর্তিগুলির সঙ্গে শহরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্মৃতিমূর্তি পরিষ্কার করার কাজে নেমে কমিউনিস্টরা রীতিমতো চাঞ্চল্য সঞ্চার করেন।

কিন্তু সাধারণ নাগরিকদের উৎসাহের অভাব দেখে মনে হয় এই ঐতিহ্যের অবসান আসন্ন।

মস্কোয় দুর্গোৎসব

মস্কো, ২ অক্টোবর ১৯৯২। কিছু প্রবাসী বাঙালির উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান মস্কোয় হত বটে, কিন্তু মস্কোয় দুর্গা পুজো ষোড়শোপচারে, তাও আবার দস্তুর মতো হল ভাড়া করে!

কিন্তু না হওয়ার কী কারণ আছে আজকের মস্কোয় খোলামেলার যুগে?

রাশিয়ার উত্তরাঞ্চল ও মঙ্গোলিয়ার সীমান্তবর্তী বৌদ্ধ ধর্ম কেন্দ্রগুলি ঘুরে গেলেন দলাই লামা, সৌদি আরবের সঙ্গে সম্প্রতি পুনঃস্থাপিত হয়েছে কূটনৈতিক সম্পর্ক, সৌদি আরবের অর্থানুকূল্যে মস্কোয় স্থাপিত হচ্ছে ইসলামচর্চার একটি কেন্দ্র। সর্বোপরি দেশে খ্রিস্টধর্মের পুনরুজ্জীবন, বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় উৎসবের রমরমা— কেউ কি কখনো ভাবতে পেরেছিল? মস্কোয় কৃষ্ণনাম সংকীর্তনের উন্মাদনা— সে আমরা বেশ কিছুকাল হল দেখে আসছি।

মস্কোয় বসবাসকারী বাঙালি বলতে এককালে বোঝাত এখানকার বিভিন্ন প্রকাশ ভবন ও রেডিয়োতে কর্মরত বাঙালি, দু-একটি ভারতীয় প্রচারমাধ্যমের দু-একজন বাঙালি এবং ভারতীয় দূতাবাসের স্বল্প কয়েক জন বাঙালি কর্মী ও তাদের পরিবার আর কিছু বাঙালি ছাত্র-ছাত্রী। গত বছর খানেকের মধ্যে প্রকাশ ভবনগুলির ভারতীয় বিভাগ উঠে যাওয়ার ফলে একদল বাঙালি বেকার হয়ে পড়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা বাড়তি রোজগারের পথ করতে পারছে না তাদের অবস্থা সঙ্গীন— শুধু স্টাইপেন্ডে চলে না।

তা সত্ত্বেও ১৯৯০ সাল থেকে দুর্গা পুজোর যে অনুষ্ঠান চালু হয়েছিল তা বন্ধ হচ্ছে না। পূর্ব ইউরোপে প্রথম এই দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল গর্বাচ্যোভের সোভিয়েত ইউনিয়নে, এখন উদ্‌যাপিত হচ্ছে ইয়েল্‌ৎসিনের রাশিয়ায়।

স্বাভাবিকভাবেই উদ্যোক্তা এখন অন্য এক সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙালি, মূলত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, বিভিন্ন ফার্মের প্রতিনিধি এবং ভারতীয় দূতাবাসের বাঙালিরা। তাঁরা ছাড়া এই মাগগি-গন্ডার বাজারে এত বড়ো দায়িত্ব আর কারাই-বা নিতে পারেন? কিছু বেকার, পেনশনভোগী আর ছাত্র-ছাত্রীরা সাধ্য কী এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করে?— বিশেষত বিদেশি মুদ্রা যাদের হাতে নেই? যে-বছর পুজো শুরু হয়েছিল তখন এক কিলো আলুর দাম ছিল ৪০ কোপেক। আজ ২০-২৫ রুবল। কিন্তু এই কয়েক বছরে ডলারেরও দাম বেড়েছে সেই অনুপাতে। আজ এক ডলারের দাম ৩০ রুবল। অতএব যাদের অর্থানুকূল্যে এই পুজো অনুষ্ঠান, রুবলের বিরাট অঙ্ক দেখে তাদের হৃদয় কম্পিত হয় না।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্রগুলিতে অধ্যয়নরত যে বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা পুজো উপলক্ষে মস্কোয় আসত তাদের অনেকে এবারে আসতে পারছে না যাতায়াতের টিকিট দুর্মূল্য হওয়ার দরুন।

প্রথমবারের পূজা অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। এবারে দেশ থেকে পুরোহিত আনা সম্ভব হল না। কিন্তু তাতে অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি হবে না। পৌরোহিত্য করবেন এককালের জনৈক ব্রহ্মচারী, বর্তমানে বিবাহসূত্রে মস্কো প্রবাসী। তাঁকে সহযোগিতা করবেন স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ।

অন্যান্য বারের মতো এবারেও পুজোর নিত্য ভোগ, প্রসাদ বিতরণ, অষ্টমীর মহাভোগ ইত্যাদির আয়োজন আছে। বিজয়া সম্মিলনী, বিচিত্রানুষ্ঠান কোনো কিছুই বাদ যাচ্ছে না। শুধু বাঙালি কেন, ভারতীয় সমাজ ও ভারতপ্রেমী রুশিদেরও বিপুল সমাগম আশা করা যাচ্ছে। গত বছর রোজ সন্ধ্যায় অন্তত তিনশো মানুষের সমাগম ঘটত। এবারে সেই সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের দেশের মানুষের মতো এদেশের লোকজনও বড়ো হুজুগে— এত দুঃখদুর্দশা ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও কিন্তু এবারে দেবীর আগমন ভালো প্রতিশ্রুতি বহন করছে না। ঘোটকে আগমণ, ফল ছত্রভঙ্গ। পঞ্জিকায় অন্তত তাই বলছে।

ফিরে এল বিগত যুগের রাশিয়া

এদেশে যখন প্রথম আসি, তখন এখানকার অনেকেই ঠাট্টা করে বলতেন, এদেশে সুবিধাভোগী শ্রেণি হল শিশুরা। সস্তায় জামাকাপড়, জুতো, বইখাতা, খেলনা, খাবার-দাবার, হলিডে

হোম, ছুটি কাটানোর সুযোগ— সব আছে কেবল শিশুদের জন্য। গর্বাচ্যোভের আমল থেকেই আর শুনিনি ঠাট্টাটা।

আগে প্রতি বছর গরমের ছুটিতে এদেশের স্কুল-পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা নামমাত্র খরচে নানা সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুদানে বিভিন্ন হলিডে হোম, পিকনিক স্পট বা ক্যাম্পে যাওয়ার সুযোগ পেত। 'পেরেস্ত্রৈকা'র সময় থেকেই খোলা হাওয়ায় সেইসব সুযোগ-সুবিধা উড়ে গেছে খড়কুটোর মতো। এখন গরমের ছুটিতে রোজগারের ধান্দায় বেরিয়ে পড়ে স্কুল-পড়ুয়া বাচ্চারা। মাথায় লম্বা হয়ে গেলেই শুরু করে দেয় কাগজের হকারি। রাস্তায় চ্যারিটি শো-র আয়োজন করেন কিছু কোটিপতি। এসব যত দেখি, আমার ততই মনে পড়ে যায় পুরোনো দিনের ছায়াছবিতে দেখা জার আমলের পেত্রোগ্রাদের পথদৃশ্য। হায়, এ কোন সভ্যতার আলো!

চুয়াত্তর বছরের সোভিয়েত ঐতিহ্য ভেঙে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য। এর সূচনা হয় গত বছরের আগস্ট মাসের পর বিভিন্ন শহর ও রাস্তাঘাটের নামবদল করে, সোভিয়েত আমলে স্থাপিত বিভিন্ন মূর্তি-টুর্তি সরিয়ে— ঠিক যেমনটি ঘটেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের প্রথম যুগে। সে-সময় অনেক সোভিয়েত নেতার জীবদ্দশাতেই তাঁদের নামে একের পর এক নগর, পল্লি ও পথঘাটের নামকরণ শুরু হয়, পুরোনো নাম বাতিল করে দিয়ে। মস্কোয় এখন সোভিয়েত ঐতিহ্যের যেটুকু কোনোমতে টিকে আছে তা প্রধানত লেনিনের নামের সঙ্গে জড়িত— লেনিন মিউজিয়াম, লেনিন স্মৃতিসৌধ, অক্টোবর স্কোয়ারে লেনিনের স্মৃতিমূর্তি, লেনিন সরণি আর পাতাল রেলের লেনিন লাইব্রেরি স্টেশন— যদিও লেনিন লাইব্রেরির নাম পালটে গেছে— এখন তা রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার নামে পরিচিত। উঠে গেছে কতকগুলি সোভিয়েত সামাজিক সংস্থা— পাইওনিয়র ও ইয়ং কমিউনিস্ট লিগ। পাইওনিয়রের স্থান শূন্য থাকছে না— প্রায় একযুগ আগেকার ছিন্ন যোগসূত্র আবার জোড়া লাগছে— গড়ে উঠছে স্কাউট ও গাইডসংস্থা। স্কুলের ছেলেমেয়েদের এককালে পাইওনিয়র ভবনগুলিতে এখন অনুষ্ঠিত হয় নানা ধরনের শো। কিছুদিন আগে দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হল শহরের এক পাইওনিয়র ভবনে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের একটি 'বল' নাচের অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে বালিকাদের গাত্রবস্ত্রের স্বল্পতা দেখে অনেকে মন্তব্য করেছিলেন, পাইওনিয়র টাই ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা বোধহয় আরো অনেক কিছু ছাড়ল। যুবভবনগুলিতে বিভিন্ন স্পনসরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সুন্দরী প্রতিযোগিতা। কেন্দ্রীয় যুবভবনে প্রতি রবিবার ধর্মোপদেশ প্রচার করছেন মার্কিন ফাদাররা। বিনামূল্যে বাইবেল বিতরণ হচ্ছে। বেতারে, দূরদর্শনে এককালে কিছু কিছু রুশি লোকগীতি ও নৃত্যের অনুষ্ঠান দেখা ও শোনা যেত— এখন তার স্থান নিয়েছে ভিনদেশি আধুনিক নৃত্যগীত। না, এসব ক্ষেত্রে প্রাচীন ঐতিহ্য ফিরে আসেনি— শূন্যস্থান পূরণ করছে ভিনদেশি সংস্কৃতি— যদিও ইজভেস্তিয়া পত্রিকায় সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে দেশের প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করেন: 'কার ঐতিহ্য বেশি সমৃদ্ধ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, যার ইতিহাস ন্যূনাধিক দুশো বছরের, নাকি রাশিয়ার— যার ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্পসাধনা হাজার বছরের পুরোনো?'

সোভিয়েত আমলে সামাজিক কার্যকলাপের মধ্যে একটি ছিল শ্রমদান দিবস— বিভিন্ন উৎসবের ঠিক আগের কোনো শনিবারে লোকে দল বেঁধে পাড়ার জঙ্গল আর রাস্তাঘাট সাফ করত, নিজেরাই সংগঠন করত। ফসল তোলার সময় যৌথ খামারিদের সাহায্য করার জন্য লোকজন পাঠানো হত সরকারি অফিস-কাছারি থেকে, যেত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও। বিনা পারিশ্রমিকে কাজ অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক বলে পরিচিত হলেও আসলে হয়তো ছিল বাধ্যতামূলক। আজকের দিনে মানুষে মানুষে যখন বাণিজ্যিক লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপিত হতে যাচ্ছে তখন ওই ব্যবস্থা একেবারেই অচল ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইদানীং শহরের যত্রতত্র বিকিকিনির হাট বসানোর সুযোগদানের ফলে রাস্তাঘাটে আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে যাওয়ায় এবং পরন্তু কর্মীর অভাবে গত এপ্রিল মাসে পুরসভা নাগরিকদের কাছে দু-সপ্তাহের জঙ্গল হটাও অভিযানের আহ্বান জানিয়েছিল। তাতে কোনো ফল হয়নি।

সোভিয়েত আমলে আরো একটি সামাজিক কাজ দেখেছি স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুরোনো কাগজ আর লোহালক্কড় জোগাড় করে স্কুলে জমা দেওয়া। উৎসাহের কমতি দেখিনি। পরে সেগুলি যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হত যথাযথ প্রসেসিং করে কাজে লাগানোর জন্য। শেষ সংগ্রহ করতে দেখেছি ১৯৮৯ সালে। আমাদের বাড়ির পাশের স্কুলের প্রিন্সিপালের নির্দেশে ছেলেমেয়েরা বরাবরের মতো উৎসাহ নিয়ে জোগাড়ও করেছিল পুরোনো কাগজ, কিন্তু অভিভাবকদের প্রবল আপত্তিতে আর জমা পড়ল না যথাস্থানে— শুধু তাই নয়, ওই কাগজ পুড়িয়ে বহ্ন্যুৎসব হল, বাড়ির জানালা থেকে দেখলাম। অভিভাবকদের একটা বড়ো অংশের বক্তব্য— পেরেস্ত্রৈকার আমলে ওইসব পাইওনিয়র-সুলভ কমিউনিস্ট অনাসৃষ্টি বরদাস্ত করা হবে না। অথচ আজ তিন বছরের মধ্যে সেগুলি সংগ্রহের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা গড়ে না ওঠার ফল হয়েছে মারাত্মক। কিন্তু সামাজিক অনেক ঐতিহ্যই ফিরে আসছে— আরো অনেক পুরোনো ঐতিহ্য— বাজার-অর্থনীতির স্বাভাবিক পথ ধরে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির চাপে পড়ে দেশের জনসাধারণের যখন নাভিশ্বাস উঠছে, তখন সরকারপক্ষের অর্থনীতিবিদরা বলছেন তাঁদের অর্থনৈতিক

সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যে গরিবগুর্বোদের দেখভালের দিকটাও দেখা হয়েছে। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়— গরিবদের স্বার্থরক্ষার এমন সমস্ত সামাজিক পরিকল্পনা রাশিয়ার সরকারের এবং অন্যান্য সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী মহলের আছে যা এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত অকল্পনীয় ছিল— ভবঘুরেদের জন্য রাতের আশ্রয়, ধর্মশালা, লঙ্গরখানা, সেকেন্ড হ্যান্ড জামা-কাপড়-জুতো কেনা-বেচার দোকান। আবার জমে উঠছে বন্ধকের কারবার। একমাত্র মস্কো শহরেই বিনামূল্যে আহার পরিবেশনের ক্যান্টিন খুলেছে একশো তিরিশটি। অধিকাংশই বেসরকারি, বিশেষত বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার উদ্যোগে। মস্কোর পুরশাসন সংস্থার নির্দেশে নির্দিষ্ট নাগরিকদের জন্য কয়েকটি রাত্রিবাস খোলা হচ্ছে জুলাইয়ের মধ্যে।

রাশিয়ায় আবার ফিরে আসছে বণিকসমাজ, তার কসাক ঐতিহ্য, স্টক এক্সচেঞ্জ, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আর বিজনেস হাউস। এককালে যা যা ছিল সে সবই ফিরে আসছে একে একে।

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

আমফান ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণ

প্রসেনজিৎ বসু ও শুভনীল চৌধুরী

করোনা মহামারি এবং দুই মাসের বেশি সময় ধরে লকডাউন চলার ফলে গ্রাম-শহরে জনজীবন এমনিতেই বিপর্যস্ত। এই সময়ে মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতন ২০ মে পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়ে আমফান ঘূর্ণিঝড়।

গত একশো বছরে এইরকম ঘূর্ণিঝড় পশ্চিমবঙ্গ দেখেনি। রাজ্য সরকারের হিসেব অনুযায়ী এই মারাত্মক ঝড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৯৮ জন, ক্ষতি হয়েছে ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। সরকারি হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২৮.৫ লক্ষ বসত-বাড়ি, ১৭ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি, ২১ লক্ষ পশু, ২৪৪ কিমি নদী বাঁধ, ৩.৬ কিমি সমুদ্র বাঁধ, ৪.৫ লক্ষ বিদ্যুৎ খুঁটি-সহ বিভিন্ন সম্পদ এবং পরিকাঠামো।

এই বিপুল ক্ষতির প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার এখন অবধি ১০০০ কোটি টাকা সহায়তা মঞ্জুর করেছে, রাজ্য সরকার প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ করেছে ৬,২৫০ কোটি টাকা। এই বরাদ্দের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার যে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে তা এইরূপ— ৫ লক্ষ পরিবারকে বাড়ির ক্ষতি বাবদ পরিবার পিছু ২০,০০০ টাকা, ১০০ দিনের কাজের মজুরি নিশ্চিতকরণে ২৮,০০০ টাকা, ২০ লক্ষ কৃষককে মাথাপিছু ১,৫০০ টাকা, ইত্যাদি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ যে প্রক্রিয়ায় দেওয়া হচ্ছে তার স্বচ্ছতা নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক প্রশ্ন এবং পক্ষপাতের অভিযোগ উঠেছে। অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার কোনোরকম ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভও হচ্ছে।

রাজ্য সরকারের উচিত ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ বিবরণ-সহ প্রত্যেকটি সরকারি নির্দেশাবলী এবং ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত জেলার ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরের ক্ষতিপূরণ প্রাপকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করা। ব্যবস্থা সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ায় রাজ্য সরকারের কোষাগারও প্রায় ফাঁকা। এই সঙ্কটের দিনে ক্ষতিপূরণের টাকা যথার্থ ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে না পৌঁছলে সেটা হবে চূড়ান্ত প্রশাসনিক ব্যর্থতা।

ঘূর্ণিঝড়ে চাষের কী ধরনের ক্ষতি হয়েছে?

ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য মাথাপিছু মাত্র ১,৫০০ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারের প্রাথমিক ঘোষণা অনুযায়ী মোট ২০ লক্ষ কৃষকদের এই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা, যার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩০০ কোটি টাকা। এখানে দুটি প্রশ্ন ওঠে। প্রথমত, ঘূর্ণিঝড়ে চাষিদের ক্ষতির আসল পরিমাণ কত এবং কোন ভিত্তিতে মাত্র ১,৫০০ টাকা মাথাপিছু ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয়েছে? দ্বিতীয়ত, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কোন পদ্ধতিতে চিহ্নিত করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা দক্ষিণ ২৪ পরগণার দুটি গ্রামে কৃষকদের মধ্যে একটি প্রাথমিক সমীক্ষা চালিয়েছি: একটি গ্রাম ভাঙর-১ ব্লকের নারায়ণপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত অন্যটি ক্যানিং-২ ব্লকের সারেঙ্গাবাদ পঞ্চায়েতে অবস্থিত। এই অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ে মূলত ক্ষতি হয়েছে সবজি চাষের, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাঠের ধান ঝড়ের আগেই কাটা হয়ে গিয়েছিল। ঝড়ের ফলে টমেটো, উচ্ছে, ঝিঙে, চিচিঙ্গে, লাউ, পটল ইত্যাদি সবজির ক্ষেত এবং ফসল প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় চাষিদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে উৎপাদনের খরচের একটি প্রাথমিক হিসেব পাওয়া গিয়েছে যা সারণি-১ এ দেওয়া হল।

সারণি ১ : বিভিন্ন সবজি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)
(হিসেব প্রতি ১০ কাঠায়)

	টমেটো এবং উচ্ছে টমেটো এবং চিচিঙ্গে টমেটো এবং ঝিঙে	পটল	লাউ
বাঁশ	৬,০০০	৫,৫০০	৩,০০০
কীটনাশক	৬,০০০	৫,০০০	১,৫০০
সুতলি	৬৫০	৩৫০	৬০০
সার	৫,০০০	৮,০০০	৩,০০০
শ্রম	৬,০০০		২,০০০
বীজ	২,০০০	—	—
জাল	১,০০০	—	—
তার	৭৫০	১,২০০	৫০০
ট্রাক্টর	—	১,২০০	৫০০
অন্যান্য	—	২,০০০	—
মোট খরচ	**২৭,৪০০**	**২৩,২৫০**	**১১,১০০**

তথ্যসূত্র : ভাঙড়-১ এবং ক্যানিং-২ ব্লকে কৃষকদের সমীক্ষা অনুযায়ী

সারণি ১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১০ কাঠা জমিতে টমেটো এবং উচ্ছে একত্রে উৎপাদন করার খরচ পড়ে ২৭,৪০০ টাকা। ঝিঙে এবং চিচিঙ্গের চাষও টমেটোর সঙ্গে একত্রে করা হয়, উৎপাদনের খরচ উচ্ছের মতনই। ১০ কাঠা জমিতে পটল চাষের খরচ ২৩,২৫০, লাউ ১১,১০০। অধিকাংশ সবজি-চাষিরাই যেহেতু ১ বিঘের উপর জমিতে চাষ করেন, সুতরাং উৎপাদনের খরচ ধরলে চাষিদের মাথাপিছু ক্ষতি ২০ হাজার টাকার কম নয়, কিছু সবজির ক্ষেত্রে চাষিদের ক্ষতির পরিমাণ ৫০ হাজার টাকারও বেশি। আমাদের উৎপাদনের খরচের হিসেবের মধ্যে চাষিদের নিজেদের শ্রম বা যারা লিজ নিয়ে চাষ করেন তাঁদের লিজের ভাড়া অন্তর্ভুক্ত নয়, সেইসব অন্তর্ভুক্ত করলে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হবে।

কৃষকদের মধ্যে এই সমীক্ষা যখন চালানো হয়েছে, মে মাসের শেষ এবং জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে, সেই সময়ের বিভিন্ন সবজির কেজি প্রতি বিক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে সবজি-চাষিদের আয় এবং মাসিক মুনাফার একটা হিসেব সারণি-২ তে দেওয়া হল। এই হিসেব অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ে যে ফসল নষ্ট হয়েছে তা বাজারে বিক্রি হলে ১০ কাঠা জমিতে টমেটো এবং উচ্ছে উৎপাদন করে একজন চাষি ফসল চক্র চলাকালীন মাসে ২৭ হাজার টাকা অবধি মুনাফা করতে পারতেন। টমেটো-ঝিঙে বা টমেটো-চিচিঙ্গের ক্ষেত্রে মাসিক মুনাফা হতে পারত ২০ হাজার টাকা মতন, পটলের ক্ষেত্রে প্রায় ১৮ হাজার টাকা, লাউয়ের ক্ষেত্রে ১৬ হাজার টাকা।

তাই উৎপাদনের খরচের ভিত্তিতেই হোক বা বিক্রয়মূল্যে আয় এবং মুনাফার হিসেবে, সবজি-চাষিদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে মাথাপিছু ১,৫০০ টাকা নিতান্তই অপ্রতুল, যথার্থ ক্ষতিপূরণ কমপক্ষে এর ১০ গুণ বা তারও বেশি হওয়া উচিত। রাজ্য সরকারের অবিলম্বে চাষের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পুনর্বিবেচনা করে বাড়ানো উচিত।

কৃষকদের আধুনিক তথ্যভাণ্ডার কেন জরুরি?

দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এখানে প্রাসঙ্গিক তা হল ক্ষতিপূরণ কারা পাবে তা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া। আমাদের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে কৃষকদের একটা বড়ো অংশ আসলে চাষের জমির মালিক বা বর্গাদার নন, তাঁরা জমির মালিকদের থেকে 'লিজ' নিয়ে চাষ করেন। এই লিজের চুক্তি অনেক সময়েই মৌখিক, যদিও কিছু ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তির উদাহরণ রয়েছে। এই লিজ নিয়ে চাষ করা কৃষকদের ক্ষেত্রে কোনো সরকারি নথিভুক্তিকরণ বা রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা নেই। যেহেতু কৃষকদের সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা বর্তমান ব্যবস্থায় জমির মালিকানার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, তার ফলে কৃষকসমাজের একটা বড়ো অংশই আজ সরকারি অনুদান-ভর্তুকি, কম সুদে কৃষি ঋণ, শস্য বিমা থেকে শুরু করে ঝড়ের ক্ষতিপূরণ, সমস্ত সহায়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

ক্ষতি যেখানে হচ্ছে জমি লিজ নিয়ে চাষ করা কৃষকদের, সেখানে ক্ষতিপূরণ শুধু জমির মালিকরাই কেন পাবেন? এই সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান তখনই সম্ভব যখন রাজ্য সরকার তৎপর হয়ে সব জেলায় ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরে কৃষকদের আধুনিক ডেটাবেস বা নামের তালিকা তৈরি করতে পারবে। জমির দলিল না থাকলেও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং আধার নম্বর-সহ লিজ নিয়ে চাষ করা সকল কৃষকদের তালিকা তৈরি করা কোনো দুরূহ কাজ নয়, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং প্রশাসনিক সক্রিয়তা থাকলেই এটা করা সম্ভব। এতে দরিদ্রতম ভূমিহীন প্রান্তিক চাষিরা উপকৃত হবেন।

সারণি ২ : সবজি চাষির আয় ও মুনাফা
(হিসেব প্রতি ১০ কাঠায়)

ফসল	উৎপাদন (কেজি)	প্রতি কেজি বিক্রয় মূল্য (টাকায়)	আয় (টাকায়)	মুনাফা (টাকায়)	ফসল চক্র (মাস)	মাসিক মুনাফা (টাকায়)
টমেটো	৮,০০০	২০	১,৬০,০০০	১,৩২,৬০০	৮	১৬,৫৭৫
উচ্ছে	৩,২০০	৩৫	১,১২,০০০	৮৪,৬০০	৮	১০,৫৭৫
ঝিঙে	২,০০০	২২	৪৪,০০০	১৬,৬০০	৮	২,০৭৫
চিচিঙ্গে	৩,০০০	১৮	৫৪,০০০	২৬,৬০০	৮	৩,৩২৫
পটল	৩,৮৪০	৩৪	১,৩০,৫৬০	১,০৭,৩১০	৬	১৭,৮৮৫
লাউ*	৬,৪০০	১৭	১,০৮,৮০০	৯৭,৭০০	৬	১৬,২৮৩

তথ্যসূত্র : ভাঙর-১ এবং ক্যানিং-২ ব্লকে কৃষকদের সমীক্ষা অনুযায়ী
*লাউয়ের দাম প্রতি পিসে নির্ধারিত হয়, কেজিতে নয়

পশ্চিমবঙ্গে স্বচ্ছভাবে কৃষকদের আধুনিক ডেটাবেস বা তালিকা তৈরি করা আজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা কৃষকদের অনুদানের জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের চালু করা সাম্প্রতিক স্কিমগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ২০১৮-র ডিসেম্বর থেকে মোদী সরকার 'পিএম-কিসান' নামের স্কিম চালু করেছে যার মাধ্যমে ছোটো এবং মাঝারি কৃষকদের প্রতি ৪ মাসে ২,০০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। ২০১৫-১৬ সালের কৃষি সেন্সাসের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেবে সারা দেশে ১২.৫ কোটি কৃষক পরিবারের এই অনুদান পাওয়ার কথা, কিন্তু পিএম-কিসান ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এখন অবধি পেয়েছে ৮ কোটি ৩৭ লক্ষ পরিবার। একটি কৃষক পরিবারে স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তান-সহ ২ হেক্টরের নীচে জমির মালিকানা থাকলেই এই অনুদান পাওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হওয়ার কথা, কিন্তু জমির মালিকানার কাগজ না থাকলে এই প্রকল্পে অনুদান পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে এখনো যুক্ত হয়নি। ২০১৯-এর জানুয়ারি থেকে রাজ্য সরকার 'কৃষকবন্ধু' স্কিমের মাধ্যমে একর প্রতি ৫,০০০ টাকার অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। এই বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি বাজেট বক্তৃতায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী জানান যে ২০১৯-এর খরিফ মরসুম পর্যন্ত কৃষকবন্ধু প্রকল্পে ৩৯.৫১ লক্ষ কৃষককে একর প্রতি পাঁচ হাজার টাকা করে মোট ৬২০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান যে ৩১ জানুয়ারি ২০২০-র মধ্যে ৪১.০২ লক্ষ কৃষকদের ১,১০০.৭৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। আবার রাজ্যের কৃষি দপ্তরের ওয়েবসাইটে কৃষকবন্ধু প্রকল্পে ৪৭.৪৩ লক্ষ কৃষক নথিবদ্ধ আছেন বলে জানানো হয়েছে। কোন সংখ্যাটি সঠিক?

২০২০-র বাজেটের দস্তাবেজে (বাজেট প্রকাশন নং-৬, পৃ. ৬-৮) দেখা যাচ্ছে যে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে কৃষকবন্ধু প্রকল্পে ৩,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও সংশোধিত হিসেবে (Revised Estimate) গোটা অর্থবর্ষে খরচ হয়েছে মাত্র ৭৭০ কোটি টাকা। এর থেকেই স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা রাজ্য সরকার গত অর্থবর্ষে তৈরি করতে পারেনি। রাজ্য বাজেট অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবর্ষে বরাদ্দ আছে ২,৭১৪ কোটি টাকা। কৃষকদের তালিকা সময় মতন প্রস্তুত হলে তবেই এই টাকা খরচ করা সম্ভব হবে।

তদুপরি রাজ্য সরকারের স্কিমের ক্ষেত্রেও জমির মালিকানার নিরিখে যেভাবে অনুদান দেওয়া হচ্ছে তাতে যে ভূমিহীন কৃষকরা জমি লিজ নিয়ে চাষ করেন, তাঁরা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন। আমাদের সমীক্ষায় ভাঙড়ের একটি গ্রামে মাত্র একজন কৃষক কৃষকবন্ধু স্কিমে কিছু টাকা পেয়েছেন বলে জানান, বাকি কৃষকরা কেউই কিছু পাননি। এই বঞ্চনার অবসান ঘটানোর জন্য কৃষকদের আধুনিক ডেটাবেস বা তালিকা নির্মাণ করা জরুরি, যেখানে লিজ নিয়ে চাষ করা ভূমিহীন চাষিদেরও সরকারি রেজিস্ট্রেশন হবে।

চাষের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পদ্ধতি অস্বচ্ছ এবং ত্রুটিপূর্ণ

আমফান ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য সরকারের উচিৎ ছিল প্রথমে লিজ নিয়ে চাষ করা চাষিদের একটি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চালু করা। সেটা না করে রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর ৩০ মে আমফান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের যে নির্দেশিকা প্রকাশ করে (#595-JS(JR)/2020) তাতে কেবল 'কৃষকবন্ধু' স্কিমে নথিভুক্ত চাষিদেরই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই তালিকা জনসমক্ষে নেই, রয়েছে কেবল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের কাছে। কৃষি দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী ৯টি জেলায়, জেলা প্রশাসন দ্বারা নির্দিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত মৌজার ভিত্তিতে কেবল সেই মৌজার 'কৃষকবন্ধু' স্কিমে নথিভুক্ত চাষিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ক্ষতিপূরণের টাকা সরাসরি ট্রান্সফার করে দেবে।

৩ জুন ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আরেকটি নির্দেশিকায় (#596-JS(JR)/2020) কৃষি দপ্তর জানায় যে ৯টি জেলায় কৃষকদের ক্ষতিপূরণের জন্য ইতিমধ্যেই ৩৪৩.৬৫ কোটি টাকা রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসনের রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই নির্দেশিকায় দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জেলাগত বরাদ্দের হিসেব নীচের সারণিতে দেওয়া হল। কৃষকদের মাথাপিছু ১,৫০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণের সরকারি হিসেব ধরলে মোট ২২ লক্ষ ৯১ হাজার কৃষক এই ক্ষতিপূরণ পাবেন— পশ্চিম মেদিনীপুরে ৩ লক্ষ ১৩ হাজার, পূর্ব মেদিনীপুরে ৪ লক্ষ, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৪ লক্ষ, উত্তর ২৪ পরগনায় ৩ লক্ষ ২০ হাজার, নদীয়ায় ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ইত্যাদি।

এই ভাবে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকগুলি সমস্যা তৈরি হয়েছে :

১. "কৃষকবন্ধু" স্কিমে নথিভুক্ত নন এমন অধিকাংশ কৃষকদেরই ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকছে না। ঘূর্ণিঝড় তো আর নথিভুক্ত কৃষকদের ক্ষেত বেছে ফসলের ক্ষতি করেনি। তাই এই প্রক্রিয়ায় অনেক কৃষক বঞ্চিত হচ্ছেন, বিশেষত যারা জমি লিজ নিয়ে চাষ করেন।

২. যেহেতু "কৃষকবন্ধু" স্কিমের নথিভুক্তদের তালিকা জনসমক্ষে নেই তাই নথিভুক্তরাও সবাই ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন কিনা তা যাচাই করার উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে

সারণি ৩ : জেলাগত কৃষকদের ক্ষতিপূরণে বরাদ্দ

জেলা	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	কৃষকদের মাথাপিছু ক্ষতিপূরণ (টাকায়)	ক্ষতিপূরণ পাওয়া কৃষকদের সংখ্যা
পশ্চিম মেদিনীপুর	৪৭	১,৫০০	৩,১৩,৩৩৩
পূর্ব মেদিনীপুর	৬০	১,৫০০	৪,০০,০০০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৬০	১,৫০০	৪,০০,০০০
উত্তর ২৪ পরগণা	৪৮	১,৫০০	৩,২০,০০০
হাওড়া	১৩	১,৫০০	৮৬,৬৬৭
হুগলি	৩৪	১,৫০০	২,২৬,৬৬৭
পূর্ব বর্ধমান	৩০	১,৫০০	২,০০,০০০
ঝাড়গ্রাম	১১.৬৫	১,৫০০	৭৭,৬৬৭
নদীয়া	৪০	১,৫০০	২,৬৬,৬৬৭
মোট	**৩৪৩.৬৫**	—	**২২,৯১,০০১**

তথ্যসূত্র : কৃষি দপ্তরের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ৩রা জুন (#596-JS(JR)/2020), পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কেন্দ্রের "পিএম-কিসান" বা ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা প্রকল্পের নথিভুক্তদের রাজ্য, জেলা, ব্লক, পঞ্চায়েত এবং গ্রাম ভিত্তিক তালিকা কিন্তু নির্ধারিত ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। সেই তালিকায় ভুল থাকলে তা যাচাই করা যেতে পারে।

৩. কোন মৌজাগুলোকে জেলা প্রশাসন ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বলে নির্ধারিত করেছে তাও জনসমক্ষে নেই। জেলাগত বরাদ্দের সারণি ৩ থেকে এটা পরিষ্কার যে ঘূর্ণিঝড়ে প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলি, বিশেষত দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং নদীয়ার যে পরিমাণ বরাদ্দ পাওয়া উচিত ছিল তা তারা পায়নি। এর কারণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কেবল মাত্র "কৃষকবন্ধু' স্কিমের নথিভুক্তদের ভিত্তিতে করা হয়েছে, ঝড়ের গতিপথের ভিত্তিতে বা ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেতের সমীক্ষার মতন কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করা হয়নি, যার ফলে গোটা প্রক্রিয়াটাই ত্রুটিপূর্ণ থেকে গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামাঞ্চলে ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার ফলে অধিকাংশ কৃষকের মনেই তৈরি হয়েছে ক্ষোভ।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের যথার্থ ক্ষতিপূরণের জন্য যে কাজগুলি রাজ্য সরকারের অবিলম্বে করা উচিত:

১. চাষের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কৃষকদের মাথাপিছু ১,৫০০ টাকার ন্যূনতম ১০ গুণ বৃদ্ধি করা।

২. লিজ নিয়ে চাষ করা ভূমিহীন চাষিদের রেজিস্ট্রেশন চালু করে তাঁদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।

৩. জেলা, ব্লক, পঞ্চায়েত এবং গ্রামসংসদ স্তরে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তদের তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করা।

৪. "কৃষকবন্ধু" স্কিমের পূর্ণাঙ্গ তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করা।

আমফান ঘূর্ণিঝড় এবং লকডাউনের প্রকোপে পশ্চিমবঙ্গের এক বিশাল অংশের দরিদ্র মানুষ এবং কৃষক বিপর্যের সম্মুখীন হয়েছেন। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের স্বার্থে সরকারের উচিত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়িয়ে অনুদান প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনা। এই কাজে সরকারের গাফিলতি মানুষের ক্ষতি বাড়াবে এবং ক্ষোভের জন্ম দেবে যা বড়ো আকারের আন্দোলনের সূচনা করবে।

অতিমারি ও সামাজিক অভিঘাত: বিকল্পের সন্ধানে কেরালা

শৌভনিক রায়

সুদীর্ঘ পাঁচ মাস পৃথিবী এক যুদ্ধক্ষেত্র। করোনা অতিমারিতে আক্রান্ত বিশ্বের ২১৫ দেশের আশি লক্ষের বেশি মানুষ। মৃতের সংখ্যা সাড়ে চার লক্ষের কাছাকাছি। বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম ভরকেন্দ্র চিন থেকে প্রথম পর্যায়ে এই রোগ বিস্তৃত হয়েছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আমেরিকা, ইরান ও বিশ্বায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলিতে। অত্যন্ত সঙ্গিন অবস্থা আমেরিকার। পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনীতি ও সর্বোচ্চ সম্পদশালী দেশে আক্রান্ত কুড়ি লক্ষের বেশি। মৃত্যু এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ছাড়িয়েছে। বোঝা যাচ্ছে সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতা। লকডাউন ঘোষণা করেও মৃত্যুমিছিল রোধ করা যায়নি। অনেকটা সামলে নিয়েছে চিন। দেরিতে হলেও সংক্রমণ কমেছে ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্সে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংক্রমণ বাড়ছে দক্ষিণ গোলার্ধের বৃহৎ অর্থনীতির দেশ ভারত, ব্রাজিল ও মেক্সিকোতে। আক্রান্তের সংখ্যায় এই মুহূর্তে ব্রাজিল ও ভারতের স্থান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ। ভারতে লকডাউন প্রত্যাহার হওয়ার পর আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে চার লক্ষ ছাড়িয়েছে। মৃত দশ হাজারের বেশি। বিশ্ববাণিজ্য ও আন্তর্দেশীয় যোগাযোগের প্রাণকেন্দ্রে এই স্পর্শবাহী রোগের প্রাদুর্ভাব হলেও ক্রমে তা উন্নয়নশীল দেশে বিস্তারের মূল কারণ এখানকার দারিদ্র্য, জনবসতির ঘনত্ব ও নাগরিক পরিষেবার অপ্রতুলতা। মানুষ চাইলেও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা অসম্ভব।

বিভিন্ন দেশে এই রোগের বিস্তার অথবা নিয়ন্ত্রণ থেকে আর একটি বিষয় পরিষ্কার। চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানের মতো দেশ যেখানে জনজীবনে রাষ্ট্রের উপস্থিতি পাশ্চাত্যের তুলনায় বেশি সেখানে রোগের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা সহজসাধ্য হয়েছে। চিন প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব না দিলেও তারপরে যান্ত্রিক তৎপরতায় লকডাউন চালু করে, আক্রান্ত অঞ্চলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং-এর মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বৃহৎ অংশের মানুষকে টেস্টিং, স্ক্রিনিং-এর আওতায় এনে সংকটে রাশ টানতে সমর্থ হয়েছে। লকডাউনের সময় জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে বিরাট ভূমিকা নিয়েছে উন্নত অনলাইন সরবরাহ ব্যবস্থা। আমেরিকা ও ইউরোপের সমস্যা অন্যত্র। ট্রাম্প প্রশাসন জনস্বাস্থ্যে বরাদ্দ ছাঁটাই করে আমেরিকার স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকে ঠেলে দিয়েছে আমূল বেসরকারিকরণের দিকে। রোগের প্রাদুর্ভাবে তারই মাশুল দিতে হচ্ছে মার্কিন নাগরিকদের। লকডাউন চালু করতে অনেক দেরি করেছে ইতালি ও স্পেন। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় বিশ্বে দু-নম্বরে থাকা ইতালি তাই সমস্যা সামলাতে পারেনি। অন্যদিকে ছোটো সমাজতান্ত্রিক দেশ ভিয়েতনাম বা কিউবা আদর্শ জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সংক্রমণ মোকাবিলা করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরায় শুরু করেছে। বিশ্বায়নের মায়াজালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রায় ভুলতে বসা এই দুই দেশের নাম উঠে এসেছে সংবাদের শিরোনামে। সমালোচিত হয়েছে রোগ মোকাবিলায় ব্রাজিল ও চিলির দক্ষিণপন্থী সরকারের চরম উদাসীনতা। ভুক্তভোগী দুই দেশের প্রান্তিক মানুষ।

আমাদের দেশের ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে আসা যাক। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা কঠোর লকডাউন পালিত হয়েছে ভারতবর্ষে। যদিও তার সময় ও সাফল্য সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান। লকডাউন তুলে নেওয়ার পর দেশজুড়ে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হারের আশঙ্কাজনক বৃদ্ধিতে বিতর্ক আরো তীব্র হয়েছে। মাত্র চার ঘণ্টার বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত লকডাউনের অভিঘাতে মহানগর থেকে বিপুল সংখ্যায় পরিযায়ী শ্রমিকের উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে প্রত্যাবর্তন গত দু-মাস যাবৎ সংবাদপত্রের শিরোনামে। বিভিন্ন সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী এঁদের সংখ্যা ন্যূনতম দু-কোটি। করোনা না হলে নাগরিক সমাজের অজ্ঞাতেই থেকে যেত এঁদের উপস্থিতি ও শহরের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। চারশো শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন পথ দুর্ঘটনা, ক্ষুধা, ক্লান্তি ও পুলিশের অত্যাচারে। ঔরঙ্গাবাদে ট্রেন দুর্ঘটনায় চোদ্দোজন শ্রমিকের জীবনহানি ও দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত আদিবাসী কন্যা জামলো মাকদামের মৃত্যু নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে। অপরিকল্পিত লকডাউনের পরিণতি— চূড়ান্ত মানবিক বিপর্যয়। দেশে বর্তমানে সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যায় উপরের দিকে আছে

মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, গুজরাট, উত্তপ্রদেশ, রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গ। অথচ সংক্রমণ শুরু হয়েছিল কেরালায়। মার্চ মাসে যে রাজ্য ছিল সংক্রমণের শীর্ষে, তার স্থান এখন অষ্টাদশ, আসাম এবং জম্মু-কাশ্মীরেরও পিছনে। লকডাউন প্রত্যাহারের পর পরিযায়ী শ্রমিক ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে কেরালাবাসীর রাজ্যে ফেরার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধি পেলেও পরিকল্পিতভাবে তা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চলেছে। কী করছে কেরালা? কীভাবে সম্ভব হচ্ছে অতিমারির বিরুদ্ধে এই ধারাবাহিক লড়াই?

কোভিড বনাম কেরালা

আলোচনার সুবিধার্থে খবরের শিরোনামে আসা তিনটি ঘটনার উল্লেখ করছি। এক, প্রবীন দম্পতি— শ্রী থমাস আব্রাহাম (৯৩) এবং শ্রীমতি মারিয়াম্মা (৮৮) দুজনেই করোনা সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। দুই, ঝুপড়িবাসী প্রান্তিক মানুষেরা ঘোর অনিশ্চিয়তা সত্ত্বেও নিষ্ঠার সঙ্গে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখছেন— এমনকী খাদ্য ও জীবনদায়ী সামগ্রী সংগ্রহ করার মতো কঠিন সময়েও। তিন, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চের অনুমতিক্রমে করোনা প্রতিরোধে দেশে প্রথম প্লাসমা থেরাপির পরীক্ষামূলক যাচাই হয়েছে কেরালার শ্রী চিত্রা তিরুনাল ইনস্টিটিউটে। তিনটি ঘটনা সংক্রমণ মোকাবিলায় কেরালার সাফল্যের বহুমাত্রিক পরিচয়। যা আলোচিত হয়েছে ওয়াশিংটন পোস্ট, গার্ডিয়ান, নিউইয়র্ক টাইমস ও বিবিসি-র মতো আন্তর্জাতিক পত্রিকা ও গণমাধ্যমে। সংক্রমণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রশংসা করেছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে এপ্রিলের শেষে অনেক জেলা থেকে লকডাউন তুলে নিয়েছে প্রশাসন। জনজীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফেরানোর কৌশলেও দেশে পথপ্রদর্শক কেরালা। মহারাষ্ট্র, দিল্লি-সহ ছ-টি রাজ্য রোগ নিয়ন্ত্রণে কেরালার পরামর্শ চেয়েছে।

২০০৬ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্যাটরিনার অভিঘাত বিশ্লেষণ করে প্রখ্যাত মার্কিন ভূগোলবিদ নিয়েল স্মিথ বলেছিলেন যেকোনো দেশে বিপর্যয়ের কারণ, তার প্রস্তুতি, প্রভাব এবং মানুষের সুরক্ষার মূল উপাদান নিহিত থাকে সেই সমাজের সমীকরণে। ইতিবাচক সমীকরণ নির্মাণের আদর্শে ভাইরাস মোকাবিলায় সক্ষমতা তৈরি করতে তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে কেরালার সরকার, স্থানীয় প্রশাসন ও নাগরিক সমাজ।

সংক্রমণ প্রতিরোধ ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা

প্রথম থেকে কেরালার স্লোগান— ব্রেক দ্য চেন। রোগের প্রবাহে প্রাচীর গড়ে তোলো। গোষ্ঠী সংক্রমণ প্রতিরোধে উচ্চ ঝুঁকির অঞ্চল চিহ্নিত করে বেশি সংখ্যায় রোগীদের পরীক্ষা, সংক্রমিতদের অনুসরণ, আইসোলেশন, সুশিক্ষিত কর্মীদের মাধ্যমে নজরদারি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ কার্যকরী করেছে কেরালা। অবস্থা সামাল দিতে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, হোটেল, কলেজ ও বিদ্যালয়ে খোলা হয়েছে আইসোলেশন এবং কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র। জিপিএস প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিটি রোগীর গতিবিধি অনুসরণ করে প্রায় দু-লক্ষ পঁচিশ হাজার মানুষকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষই আছেন নিজের বাড়িতে। সচেতন নাগরিক সমাজ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন সরকারের সঙ্গে। এটাই কেরালার বৈশিষ্ট্য। লকডাউন কার্যকরী করতে খুব বেশি সমস্যা হয়নি সরকারের। প্রতিদিন নিয়ম করে মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেছেন। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহযোগিতা চেয়েছেন রাজ্যবাসীর। কেরালাই প্রথম রাজ্য যে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ১০ মার্চ গোটা দেশে লকডাউনের আগেই কলেজ, বিদ্যালয় ও সিনেমা হল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিস্থিতির মোকাবিলায় জরুরি ভিত্তিতে বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করে। অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে মহিলা স্বনিযুক্তি গোষ্ঠী কুদুম্বশ্রী, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ির অসংখ্য কর্মী। মার্চ মাসে সংক্রমণের নিরিখে সব থেকে বিপদজনক অবস্থান থেকে এক মাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি। মৃত্যুহার এক শতাংশের নিচে। নিশ্চিত করা হয়েছে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা। এই পরিসংখ্যাণ দেশের মধ্যে তো বটেই, অনেক উন্নত দেশের কাছেও রীতিমতো ঈর্ষণীয়। উল্লেখযোগ্য বিষয়, দিন পনেরো আগে তেরো লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বাৎসরিক পরীক্ষায় বসেছে এবং পরিকল্পিত সুরক্ষা ব্যবস্থার কারণে কেউ সংক্রমিত হয়নি। অতিমারি মোকাবিলায় ভিয়েতনাম, কিউবার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের ছোটো রাজ্যটি উঠে এসেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদের শিরোনামে।

খাদ্য ও জীবনদায়ী সামগ্রীর নিশ্চিত সরবরাহ

জীবন ও জীবিকার জোড়া বিপদের মুখোমুখি শহরের প্রান্তিক মানুষ। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ দেশে লকডাউনের দু-সপ্তাহ পরে এদের ছিয়ানব্বই শতাংশের হাতে রেশন পৌঁছোয়নি। সত্তর শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন সরকার বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কারোর কাছ থেকেই তৈরি করা খাবার জোটেনি তাঁদের। সব থেকে সঙ্গিন অবস্থা উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকে। কেরালায় এদের পরিচয় 'অতিথি শ্রমিক'। বেশ কয়েকটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত তাঁরা। স্বাভাবিক সময়ে শহরে দৈনন্দিন জীবন চালু রাখতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। কঠিন সময়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য তৈরি হয়েছে বিশেষ শিবির। তাঁরা

যাতে সংক্রমিত না হন তা দেখভাল করতে ভ্রাম্যমাণ পরিষেবা চালু হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমিকদের চাহিদা মেনে স্থানীয় খাবারের পরিবর্তে সরকার পৌঁছে দিয়েছে চাল, ডাল, আনাজ। শ্রমিকরা নিজেদের পছন্দ মতো খাবার রান্না করে নিয়েছেন। পনেরোশো কমিউনিটি কিচেনে বত্রিশ লক্ষ মহিলা পরিচালিত চার লক্ষ কুদুম্বশ্রী গোষ্ঠীর প্রস্তুত খাদ্য প্রতিদিন পৌঁছে গেছে তিন লক্ষ মানুষের কাছে। অর্থনৈতিক সংকটের সময় মানসিক বিপর্যয় খুব স্বাভাবিক ঘটনা। অনেকেই এর শিকার হয়েছেন। সীমিতভাবে হলেও আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে দেওয়া হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা।

সার্বিক প্রশাসনিক ও সামাজিক উদ্যোগ

সংক্রমণ প্রতিরোধে কেরালার দ্বিতীয় স্লোগান— শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সামাজিক বোঝাপড়া। শুনতে সহজ, কিন্তু কাজে পরিণত করা খুব কঠিন। সেটাই করে দেখাচ্ছে কেরালা। বহুদিনের অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত সামাজিক পুঁজি এই কাজ কিছুটা সহজ করেছে। ভারতবর্ষের মতো আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর দেশে এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে খুব কিছু প্রত্যাশিত নয়। তাই দেশের মধ্যে প্রথম কেরালা সরকার নিজের উদ্যোগে কুড়ি হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্রকল্প ঘোষণা করে। বিগত দু-বছরের উপর্যুপরি বন্যার পর এই বৃহৎ অঙ্কের প্রকল্প সত্যিই বিস্ময়কর এবং রাজ্যের মানুষের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার উজ্জ্বল উদাহরণ। বিশেষ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য জরুরি পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ থেকে আগামী তিন মাস সামাজিক চাহিদা এবং ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা। এর মধ্যে আছে পঞ্চান্ন লক্ষ প্রবীণ ব্যক্তির দু-মাসের অগ্রিম পেনশন, দরিদ্র পরিবারে এক হাজার টাকার অনুদান ও বিনামূল্যে রেশন, কুড়ি টাকায় সার্বজনীন ভর্তুকিযুক্ত আহারের সুবিধা, সংক্রমণ রুখতে আপৎকালীন স্বাস্থ্য পরিষেবা, কুদুম্বশ্রীর মহিলাদের সহজ শর্তে ঋণ এবং জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে অগ্রিম অনুদান। এছাড়াও রাজ্যে চালু আছে চার হাজার কোটি টাকার বিশেষ জনস্বাস্থ্য প্রকল্প যার মধ্যে তৈরি হচ্ছে হাসপাতাল, কেনা হচ্ছে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও নিয়োগ করা হচ্ছে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী। ২০১৮ সালের নিপা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের সময় শুরু হয়েছিল এই প্রকল্প। নিপার সফল মোকাবিলার অভিজ্ঞতা এই যুদ্ধে কেরালাকে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে। জরুরি অবস্থা সামলাতে পরিকল্পিতভাবে সমন্বয় সাধন করে চলেছে সরকারি দপ্তরসমূহ। স্থানীয় প্রশাসন ও নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশ— ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গণসংগঠন, বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল, সবমিলিয়ে এক সচেতন পরিমণ্ডল। এইসময় অন্য অনেক রাজ্য থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের হেনস্থা, মহল্লা থেকে নির্বাসনের মতো দুঃসংবাদ এলেও কেরালা এই ব্যাধি থেকে অনেকাংশে মুক্ত। লকডাউন লঙ্ঘনের ঘটনা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। পারস্পরিক বিশ্বাস, উন্নত সমাজবোধ ও বিপর্যয় মোকাবিলার সংস্কৃতি রাজ্যকে এগিয়ে রেখেছে এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে।

সচেতন নাগরিক পরিমণ্ডল ও উন্নত সংস্কৃতি লালিত হয়েছে বিগত কয়েক দশকের উন্নয়নের পথে। ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে ১৯৫৭-৫৯ দেশের প্রথম নির্বাচিত বামপন্থী সরকার তৈরি করে ছিল রূপরেখা। নাম্বুদ্রিপাদের ভাবনায় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটেছিল কেরালার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের। এরও আগে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমৃদ্ধিশালী ত্রিবাংকুর ও কোচিনের মহারাজারা গুরুত্ব দিয়েছিলেন নারীশিক্ষা, সমাজসংস্কার ও জনপরিষেবায়। ১৮৭৯ সালে কলেরার টিকা বাধ্যতামূলক হয়েছিল সরকারি কর্মচারী, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও কয়েদিদের জন্য। কেরালার খ্রিস্টান সম্প্রদায় অনেকদিন ধরে উন্নতমানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান চালানোর কাজে সুপরিচিত। এই সামাজিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করেই বাম সরকারের কর্মসূচির কেন্দ্রে ছিল ভূমি সংস্কার, সার্বজনীন শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের মতো বিষয়। এই অভিমুখে পরবর্তীকালে আরো গতি আনে ৭৩ ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধন। ১৯৯৬ সালে শুরু হয় জনগণের পরিকল্পনা বা পিপলস প্ল্যান। বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসারে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে একতৃতীয়াংশ ব্যয়ের পরিকল্পনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব বর্তায় স্থানীয় পৌরসভা ও পঞ্চায়েতের উপর। এই কারণে কেরলবাসীর কাছে গণস্বাস্থ্য পরিষেবা অনেক বেশি সহজলভ্য। নীতি আয়োগের ২০১৯-এর তথ্য অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরিষেবায় কেরলের স্থান রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম। করোনা প্রমাণ করেছে বাজার নয়, সহজলভ্য গণস্বাস্থ্য ব্যবস্থা কত জরুরি। সেই পথেই হেঁটেছে কেরালা। কিন্তু শুধু পরিষেবার উপস্থিতি যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন রোগ সম্পর্কে সচেতনতা। মানতে হবে বিধিনিষেধও। প্রয়োজন শিক্ষার। এক্ষেত্রেও এগিয়ে আছে কেরালাবাসী। সাক্ষরতার হার চুরানব্বই শতাংশ— দেশের মধ্যে সর্বাধিক। নীতি আয়োগের তৈরি কার্যকরী বিদ্যালয় শিক্ষার সূচকে প্রথম স্থানে কেরালা। সর্বনিম্ন স্থানে উত্তরপ্রদেশ।

আত্মবিশ্বাস নিয়ে লড়ছে সরকার ও নাগরিক সমাজ। আরো দীর্ঘ হতে পারে এই যুদ্ধ। তার জন্যে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন মূল্যায়ন করা হচ্ছে সংক্রমণ ও প্রতিরোধ কর্মসূচির গতি প্রকৃতি। আছে অনেক ঝুঁকি, সঙ্গে রয়েছে অনিশ্চয়তা। কেরালার অর্থনীতির মূলস্তম্ভ পর্যটন ও মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত অনাবাসী ভারতীয়দের প্রেরিত অর্থ। প্রায় নয় শতাংশ অর্থাৎ ত্রিশ লক্ষ কেরলবাসী রাজ্যের বাইরে থাকেন। এঁদের অনেকে

ফিরে এসেছেন। লকডাউনের ফলে বিরাট রাজস্ব ক্ষতির সম্মুখীন রাজ্য। কর আদায় কমতে পারে পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার কোটি টাকা। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনেও এসেছে ভাঁটার টান। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য অপ্রতুল। অনেক টালবাহানার পর জুন মাসে বকেয়া পণ্য পরিষেবা করের ক্ষতিপূরণ জমা পড়েছে রাজ্যের তহবিলে। কেরালাই প্রথম দাবি তুলেছিল জরুরি পরিস্থিতিতে রাজ্যের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের তিন শতাংশ থেকে বাড়িয়ে পাঁচ শতাংশ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার তা মেনে নিয়েও ঘাটতি কমানোর শর্ত জুড়েছে। ২০০৭ সালে প্রকাশিত কানাডার সমাজকর্মী নাওমি ক্লেইন তাঁর 'দা শক ডক্ট্রিন: দা রাইজ অফ ডিজাস্টার ক্যাপিটালিজম' পুস্তকে লিখেছেন বিপর্যয়কালেও নব্য উদারনীতি সরকারি বিনিয়োগ কমানো ছাড়া অন্য কোনো নীতিতে বিশ্বাস করে না। কেরালার লড়াই এই নীতির বিরুদ্ধেও। তাই রাজনৈতিক ঝুঁকি সত্ত্বেও জনমোহিনী পথে না হেঁটে ও বাজার সর্বস্বতার বিপরীতে জনস্বাস্থ্যে বিনিয়োগ বাড়ানো ছাড়াও সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধি ও কৃষি এবং ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পে উৎসাহ প্রদান কেরালা সরকারের অভিমুখ। দেশের মানুষ ও বহির্বিশ্ব অধীর আগ্রহে নজর রাখবে বিপর্যয় মোকাবিলায় এই বিকল্প যাত্রাপথে।

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

দারিদ্র ও লকডাউন

ইন্দ্রনীল
সুমিত মজুমদার

প্রায় ৭০ দিন ধরে চলা লকডাউন-এর প্রভাব যে দেশের অধিকাংশ মানুষের উপর বেশ ভয়াবহ ছিল, তা এখন পরিষ্কার। লকডাউন-এর অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে, কাজের আশা হারিয়ে, খিদের ঠেলায়, বাঁচার তাগিদে মরিয়া হয়ে কাতারে কাতারে পরিযায়ী শ্রমিক কয়েকশো মাইল পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে গেছেন। অনেকেই ভীড়ঠাসা লরি বা ট্রেনে। অসহায় মানুষগুলির ঘরে ফেরার মরিয়া চেষ্টা আমাদের মনে করিয়ে দেশ ভাগের সেই কঠিন দিনগুলি।

ভারতের ইতিহাসে নিরুপায় হয়ে মানুষের পথ চলা নতুন নয়। বারে বারে দুর্ভিক্ষ, ক্ষরা, মহামারী মানুষকে ঘরছাড়া করেছে দুমুঠো অন্নের সন্ধানে। কিন্তু তুঘলকি কায়দায় মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই লকডাউন স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে অভূতপূর্ব। বিশেষ করে জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব বেশ বিস্তৃত। গণমাধ্যমে এই নিয়ে আলোচনা তো কম হল না! অনেকেই এ বিষয়ে একমত যে দারিদ্র বেড়ে গেছে এই সময়ে। বেড়েছে অনাহার।

আমরা এই লেখায় ২০১৭-১৮ সালের জাতীয় নমুনা সমীকার কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সমীক্ষা বা Periodic Labour Force Survey-র তথ্য (unit level data) ব্যবহার করে, লকডাউন-এর প্রভাব দারিদ্রের উপর ঠিক কতটা হতে পারে তার একটা প্রাথমিক হিসাব (estimate) কষার চেষ্টা করেছি। বলাই বাহুল্য বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষের উপর লকডাউন-এর প্রভাব আলাদা আলাদা। সেই বিভিন্নতাকে মাথায় রেখে এই মূল্যায়ণ। দীর্ঘমেয়াদী দারিদ্র এড়াতে কী করা যেতে পারে সে বিষয়েও আমরা আলোচনা করেছি।

বিতর্কিত দারিদ্র রেখা

ভারতে দারিদ্র রেখা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। দারিদ্র রেখার উপর ভিত্তি করে গণবণ্টন সহ অনেক সরকারি প্রকল্পের আওতায় কারা আসবেন তা ঠিক হয়। নীতি নির্ধারণে দারিদ্র রেখার গুরুত্ব অনেক। অনেকেই মনে করেন আমাদের দারিদ্র রেখা যে খরচের স্তরের উপর দাঁড়িয়ে তা একজন মানুষের খেয়েপরে বাঁচার জন্য যথেষ্ট নয়। এতো কম টাকায় জীবন অতিবাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও পুষ্টি জোগাড় করা সম্ভব নয়। তাই দারিদ্র রেখার পুনর্মূল্যায়ণ করতে হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরকারি দারিদ্র রেখার পুনর্মূল্যায়ণ হয়নি। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (NSS-Consumer Expenditure Survey) থেকে বিভিন্ন খাতে পরিবারের খরচ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়, যা দারিদ্র রেখা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। প্রতি পাঁচ বচর অন্তর এই সমীক্ষা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ সমীক্ষা রিপোর্ট ও তথ্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করেনি। ফলত ভারতে দারিদ্র অনুমানের কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে। নোটবন্দী আর পরবর্তী পর্যায়ে আর্থিক মন্দার প্রভাব মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উপর ঠিক কতটা পড়েছিল সেটাও ঠিকভাবে হিসাব করা সম্ভব হচ্ছে না। তা নিয়ে প্রতিবাদ অনেক হয়েছে। কে কার কথা শোনে।

পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি জরিপ বা কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সমীক্ষা (পিএলএফএস), ২০১৭-১৮ (যা এনএসএসও-এর কর্মসংস্থান-বেকারত্ব জরিপকে প্রতিস্থাপন করে)-কে ব্যবহার করে দারিদ্র রেখার নীচে কত মানুষ আছেন তার মূল্যায়ণ করা সম্ভব। ভোক্তা ব্যয় সমীক্ষা (Consumer Expenditure Survey)-তে প্রায় কয়েকশো নিত্যদিনের ব্যবহারের জিনিসের উপর পরিবারে কত খরচ হয় তার হিসেবে পাওয়া যায়। এইসব খরচ জুড়ে পাওয়া যায় পরিবারের মোট খরচ, ফলে এর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। পিএলএফএস-এ রয়েছে শুধু মোট খরচ, ফলে এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কিন্তু উন্নততর তথ্যের অভাবে আমরা পিএলএফএস ব্যবহার করেছি। এই সমীক্ষার একটা সুবিধা হল এখানে একসঙ্গে আয় ও ব্যয়-এর হিসেব একসঙ্গে পাওয়া যায়, আমরা এটা কাজে লাগিয়েছি।

ওরা কাজ করেন তবুও গরিব থেকে যান

লকডাউনের আগে প্রায় ৫৬ কোটি লোকের মাসিক খরচ দারিদ্র

সীমার থেকেও কম ছিল। এদের তিন চতুর্থাংশ (৪২ কোটি) গ্রামীণ অঞ্চলে বাস করতেন। এই সরকারি দারিদ্র রেখার নিরিখে বাকি প্রায় ১৪ কোটি গরিব লোক শহরাঞ্চলে বাস করেন। আর যাদের আয় এর চাইতে বেশি? আরো বিশ কোটি লোক রয়েছেন যাদের গড় মাসিক খরচ ব্যয় দারিদ্রসীমার চেয়ে মাত্র ২০ শতাংশ বেশি। পরিবারের নানা ওঠাপড়ায়, কারোর অসুখের খরচ যোগাতে হলে, বা অন্য কোনো কারণে কাজ না করতে পারলে এদের দারিদ্র আর ক্ষুধার ঘূর্ণাবর্তে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। পিএলএফএস সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী সাধারণভাবে যদি আয় আর খরচ মাত্র ২০ শতাংশ হ্রাস পায় তবে অতিরিক্ত আরো ২৪ কোটি মানুষ দারিদ্র রেখার নীচে চলে যাবেন। এই ধরনের আয়-খরচের বিন্যাসের ফলে যে কোনো ধরনের আর্থিক সঙ্কটের প্রভাব হতে পারে মারাত্মক। ঠিক তাই হয়েছে লকডাউনের ফলে।

লকডাউন খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে একটা বড় ধাক্কা

পিএলএফএসের তথ্য থেকে আমাদের হিসেব অনুযায়ী জোর করে চাপিয়ে দেওয়া লকডাউনের কারণে দারিদ্রসীমার নীচে চলে যাবেন প্রায় অতিরিক্ত ৪০ কোটি মানুষ। এই লকডাউন-প্ররোচিত নতুন দরিদ্রদের প্রায় ১২ কোটি লোক শহুরে এবং আরো ২৮ কোটি মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন। যারা ইতিমধ্যে দরিদ্র ছিলেন তাদের জীবনযাত্রা আরো কঠিন হতে চলেছে। পরিভাষায় এই ঘটনাকে 'poverty deepening' বলা হয়।

লকডাউনের আগে প্রায় ১৬ শতাংশ মানুষের মাথাপিছু খরচ ছিল দারিদ্র রেখার নির্দিষ্ট খরচসীমার প্রায় এক তৃতীয়াংশ। এরা রোজ ৩০ টাকা বা তারও কম টাকায় নিজের খরচ চালান। এদেরকে আমরা অতি গরিব বলে চিহ্নিত করতে পারি। যা হিসেব পাচ্ছি তাতে লকডাউনের পরে প্রায় ৬২ কোটি (৪৭ শতাংশ) মানুষ চরম দারিদ্রে তলিয়ে যেতে পারেন।

উচ্চ বেতনের কর্পোরেট চাকরিতে কর্মরত একটি ছোটো অংশ বা স্থায়ী সরকারি চাকুরে বাদ দিয়ে আর সব ধরনের পেশার মানুষ লকডাউনের কারণে কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। যেমন সংগঠিত ক্ষেত্রে এরকম অনেক কর্মী আছেন যাদের চাকরির সুরক্ষা বা অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। বিভিন্ন সংস্থার করা সমীক্ষা আর খবর থেকে বোঝা যায় যে এইধরনের পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদেরও আয়ের ক্ষতি হয়েছে, কাজও হারিয়েছেন অনেকেই।

সাধারণভাবে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা অধিকাংশেরই অবস্থা তুলনায় অনেকটা খারাপ হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অসংগঠিত ক্ষেত্র জাতীয় আয়ে বড়ো অবদান রাখে। আর বহু মানুষের কাজের যোগান দেয়। কৃষিকাজ বা দিনমজুর ছাড়াও নানারকম খুচরো বিক্রেতা, দোকানদার, রিক্স, টোটো বা অটো চালক এদের মধ্যে পড়েন। এদের কাজকর্মে, আয়ে বড়সড় আঘাত এসেছে।

সংগঠিত ক্ষেত্রে বড়সড় ছাটাই-এর খবরও আসছে। শহরাঞ্চলে নানা ধরনের দিনমজুরি করে সংসার চালানো মানুষেরা গ্রামীণ অঞ্চলের তুলনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এই শ্রমিকদের মধ্যে যারা অকৃষি কার্যক্রমে যুক্ত তাদের তুলনায় যারা কৃষিতে কাজ করেছেন তাদের কম ক্ষতি হবে কারণ কৃষিকাজ অন্য কাজের তুলনায় অল্প সময়ের জন্য বন্ধ ছিল।

অপরিকল্পিত লকডাউন দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনে যে ব্যাপক বিপর্যয় ডেকে এনেছে সে তো দেখাই যাচ্ছে। এই সময় মানুষের হাতে নগদ টাকা কমেছে, যেটুকু জমাসঞ্চয় ছিল তাও শেষ হয়ে গিয়ে থাকবে বেশিভাগ মানুষের। বিকল্প রোজগারের অভাবে মারাত্মক খাদ্যের ঘাটতি, ক্ষুধার প্রকোপ বাড়াই স্বাভাবিক, এসময়ে ধার করার প্রবণতাও বাড়বে। লকডাউনের কারণে আগের তুলনায় পরিবারের মোট খরচ কমেছে আনুমানিক ১.৯ লক্ষ কোটি টাকা, যা জিডিপির আনুমানিক ০.৮৫ শতাংশ। এখানে উল্লেখ করতে হবে যে সমীক্ষার সীমাবদ্ধতার কারণে এটি একটি স্থূল মূল্যায়ণ।

NSSO সমীক্ষা খুব বেশি খরচ করেন, সমাজের ওপর তলার এরকম পরিবারের খরচের ধরন তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। যদিও এই শ্রেণির জীবনযাপনের মান কিছুটা হ্রাস পাবে, বিশেষত বিলাসিতার পিছনে খরচ হয়তো কিছুটা কমবে, তবে আপাতত এই দিকটি উপেক্ষা করা ঠিক হবে। আমাদের দেশের আপামর জনগণের অবস্থা এবং তাদের বেঁচে থাকার বিষয়ে আমাদের চিন্তিত হওয়া উচিত।

ক্যুও ভাডিস ডমিনী

সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতকে বার বার দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘরবাড়ি ছেড়ে খাবারের সন্ধানে শহরে আসতে হতো। মুঘল সম্রাট শাহজাহান এক সময় গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের পরিযায়ী মানুষদের জন্য লঙ্গরের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রতি সোমবার সরাসরি অর্থ সাহায্যের প্রথা চালু করেছিলেন। শিবাজী-সহ ইতিহাসের পাতায় এরকম আরো রাজরাজাদের কথা রয়েছে যারা মানুষের কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন, খাদ্য, অর্থ, বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মানুষের ভোটে জিতে আসা সরকার যে কঠিন সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়াবে সেটাই কাঙ্খিত।

কিন্তু আর্থিক কষ্টের যে স্তর তার তুলনায় সরকারের প্রচেষ্টা অপ্রতুল বলে মনে হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর ঘোষিত দ্বিতীয়

অর্থনৈতিক প্যাকেজ বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণিগত প্রকৃতিটিকে নির্মমভাবে তুলে ধরেছে। বিশেষত এনআরইজি-এ (১০০ দিনের কাজ) মজুরির ২৫ টাকার বৃদ্ধির বিষয়টি এক নির্মম পরিহাস বলে মনে হয়েছে। দরকার ছিল এনআরইজি-এর টাকা বাড়িয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টা করা। এনআরইজিএ-তে কাজের চাহিদা বাড়তে শুরু করেছে, আগামী দিনে তা আরো বাড়বে বলেই মনে হয়। আমাদের হিসেবে পুনর্নির্মাণ প্রকল্পটির জন্য ৯ কোটি কর্মীদের কমপক্ষে পরবর্তী ৬ মাসের জন্য প্রতি মাসে ২০ দিনের কর্মসংস্থান করা দরকার। এর জন্য ১.৬ লক্ষ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন যা দেশের মোট আয়ের মাত্র ০.৬ শতাংশের মতো।

গণবন্টন ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করার দাবি উঠেছে বারবার শ্রমিক সংগঠন, খাদ্যের অধিকার আন্দোলন-সহ জন-আন্দোলনগুলির তরফ থেকে। সবার কাছে রেশন ব্যবস্থার সুবিধা পৌঁছে দিতে হলে প্রথমে সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষের উপর নজর দেওয়া দরকার। দিল্লিতে যাদের কাছে রেশন কার্ড নেই তাদের খাদ্য কুপন দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল দিল্লি রাজ্য সরকার। দেখা গেল দলিত ও মুসলমানসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ যারা ময়লা কোড়ানোর কাজ করেন বা স্যানিটেশনের কাজ করেন, ঠেলা চালিয়ে বেসাতি করেন, তাদের কাছে স্মার্টফোন না থাকায় তারা সুবিধা নিতে পারলেন না। পৌর কর্মীদের সাহায্যে এই বঞ্চিত মানুষগুলিকে স্থানীয় পর্যায়ে চিহ্নিত করে আগে এদের কাছে রেশন পৌঁছে দিতে পারা জরুরি ছিল এই সময়। তথ্যপ্রযুক্তির উপর অন্ধ নির্ভরশীলতা জনমুখী প্রকল্পে বঞ্চিত মানুষদের কাছে পৌঁছোনোর অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

শহরাঞ্চলে অল্প পয়সায় কাজ করে যে মানুষেরা শহর অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছিলেন এতদিন, তাদের অনেকেই কিন্তু ফিরে গেছেন তাদের গ্রামে। যারা টিকে যাচ্ছেন তাদের জন্য এই সময় দরকার এক বিশেষ কাজের গ্যারান্টি প্রকল্প। পৌরসংস্থাগুলির সাহায্য নিয়ে মাসে অন্তত বিশ দিনের কাজের যোগান দেওয়া জরুরি। এই প্রকল্পের সাহায্যে শহরাঞ্চলের সামাজিক পরিকাঠামো তৈরির কাজে জোর দেওয়া যেতে পারে। বস্তি অঞ্চলের বিকাশ, জল ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি করা, সাধারণ সম্পদের (কমন প্রপার্টি রিসোর্সেস) পুনরুজ্জীবন-এর কাজ করা যেতে পারে সহজেই। ফলে শহরের প্রান্তিক মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার আর পরিষেবার মানের উন্নতি সম্ভব হবে।

করোনার ভয় আর লোকডাউনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার জন্য বড়ো বড়ো শহর থেকে যারা গ্রামে ফিরে গেছেন তারা চট করে আর বড়ো শহরে নাও ফিরতে পারেন। আসতে পারেন ছোটো জেলা শহরগুলিতে, তাই ছোটো শহরগুলিকে এই কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় আনা জরুরি। এনআরইজিএ যে মজুরি দেয় তার থেকে ৩০ শতাংশ বেশি হারে মজুরি নির্ধারণ করতে হবে শহরাঞ্চলে। এই প্রকল্প শিল্প শহরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। শিল্পের সঙ্গে জড়িত কর্মীদের চিহ্নিত করে তাদেরকে সরাসরি মজুরি দিলে একদিকে যেমন রোজগার বাড়বে তেমনি মন্দার প্রভাব থেকে টেনে তোলা যাবে এসএমই ক্ষেত্রকে।

নব্বইয়ের দশক থেকে আমরা যে নব্য-উদারবাদী আর্থিক বৃদ্ধি দেখেছি ভারতের অর্থব্যবস্থায় তা মূলত শ্রমজীবী মানুষের কোমড় ভেঙে দিয়েছে। ক্রমাগত কমেছে শ্রমের মজুরি। বেড়েছে মালিকদের কাছে জমা হওয়া উদ্বৃত্তের পরিমাণ। উদ্বৃত্ত বাড়লেও বিনিয়োগ বাড়েনি আশানুরূপ।

রাষ্ট্র এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে পরিকল্পিতভাবে কাজ করেছে। একে একে শ্রমিকদের কষ্টার্জিত অধিকার কেড়ে নিয়ে, তাদের সংগঠিত শক্তিকে দুর্বল করেছে। তাদের নিজের ভিটে ছাড়তে বাধ্য করেছে, ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকার। যাতে যেকোনো মজুরিতেই এই নিরুপায় মানুষগুলি কাজ করতে বাধ্য হন, কোনো সামাজিক সুরক্ষার ব্যয় সরকারকে বা মালিক-শ্রেণিকে বহন করতে না হয়।

নির্মম আর্থিক নীতির অভিমুখ যদি বদলানোর চেষ্টা না করা হয়, মানুষের খেয়ে পরে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা যদি প্রাথমিকতা না পায়, অনাহার বাড়বে, বাড়বে চরম দারিদ্র। জন্ম নেবে সামাজিক অস্থিরতা। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা আর উগ্র দেশপ্রেমের ভিত্তিতে বেড়ে ওঠা বিজেপি সরকারের এইসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

উন্নয়নের জোয়ার ভাঁটায়

অর্ধেন্দু সেন

আমি দক্ষিণের রায় সর্বলোকে গুণ গায়
আঠারো ভাটিতে পুজে সবে।

সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ দক্ষিণ রায়ও কিন্তু তাঁর রাজত্ব ধরে রাখতে পারেননি। বনবিবির সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরে তাঁকে অর্ধেক রাজত্ব ছেড়ে দিতে হয়। এই যুদ্ধ কি ছিল কোনো অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের যুদ্ধ? সুন্দরবনের সম্পদ কারও একার নয়, খেটে-খাওয়া বাউলে মউলেদের যৌথ সম্পত্তি— এই তত্ত্বেরই কি জয় হয়েছিল এই যুদ্ধে? বলা কঠিন। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে শ্রমজীবীরাই কি পারল এই সম্পদ রক্ষা করতে?

কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল সতেরো শতকের। বনবিবির জহুরানামা উনিশ শতকের। মাঝখানে ঘটে গেছে এক কাণ্ড— ইংরেজের বাংলায় আগমন। ১৭৫৭ সালে সিরাজদৌল্লা পরাজিত হলেন ক্লাইভের হাতে। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ পেলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যায় রাজস্ব আদায়ের অধিকার। ১৭৯৩ সালে এল কর্নওয়ালিসের 'স্থায়ী বন্দোবস্ত'। জমিদারের স্বার্থ না দেখলে তারা ইংরেজের স্বার্থ দেখবে কেন? রাজস্ব আদায়ের অধিকার কিন্তু ব্রিটিশ কোম্পানি পায়নি। পেয়েছিলেন ক্লাইভ ব্যক্তিগতভাবে। পরে তিনি কোম্পানিকে বিক্রি করে দেন তাঁর অধিকার। অনেকটা বিশ্ব-বাংলা লোগোর মতো কেস।

রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে। চোখ পড়ল সুন্দরবনের উপর। গঙ্গা পদ্মা মেঘনার তৈরি বিশাল ব-দ্বীপ। ছোটো ছোটো দ্বীপে বিভক্ত। জনবসতি নেই বললেই চলে। জরিপ হয়েছিল ড্যামপিয়ার-হজেস লাইন পর্যন্ত। তার দক্ষিণে জরিপ সম্ভব হয়নি। সরকারের খাতায় এই জরিপ-বর্জিত দেশেরই নাম হয়ে গেল সুন্দরবন। বিরাট বিরাট প্লটে বা লটে ভাগ করে জমি নিলাম করে দেওয়া হল। প্রার্থীর অভাব হল না। কিন্তু ওই জঙ্গল পরিষ্কার করবে কে? সেখানে চাষ করবে কে? জমিদার তো থাকবেন কলকেতায়। প্রজা পাওয়া যাবে কোথায়? ধীরে ধীরে সে সমস্যার সমাধান হল।

বিশেষ বিশেষ সুবিধা দেওয়া হল জমিদারদের। এই শ্রেণি সেই থেকে সুবিধা পেতে অভ্যস্ত। আর গরিব মানুষ সুবিধা না পেয়ে কষ্ট করতে অভ্যস্ত। তাই উনিশ শতকের মাঝামাঝি জনবসতি শুরু হল অনেক জায়গায়। জঙ্গল কেটে সাফ করার কাজ ছিল বিপদসংকুল। এই কাজে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হিঙ্কেল সাহেব। লোকে তাঁকে ভগবানের মতো পুজো করত। তাঁরই নামে হিঙ্গলগঞ্জ। জমিদারের প্ররোচনায় আর সাহেবদের সমর্থনে আদিবাসী পৌণ্ড্র নমঃশূদ্র মিলে গাছ কাটল আর বাঘ মারল সুন্দরবনকে বাসযোগ্য করার জন্য।

কিন্তু শুধু বাস নয়। খাজনা দিতে হবে। তাই চাষ করতে হয়। মুশকিল হল দ্বীপগুলো সব উলটে রাখা কড়াইয়ের মতো। ধারগুলো জোয়ারের নোনা জলে ডুবে যায় দিনে দু-বার। শুধু মাঝখানটা জেগে থাকে। কোটাল হলে সেখানেও জল দাঁড়ায়। অগত্যা বাঁধ দিতে হল জল আটকাতে। একটু একটু করে ৩৫০০ কিলোমিটার বাঁধ উঠে গেল। যেখানে দেখা গেল বাঁধের সামনে নতুন পলি জমেছে সেখানে বাঁধ এগিয়ে নেওয়া হল। যেখানে বাঁধ ভেঙে জল ঢুকল সেখানে পিছিয়ে আসা হল। প্রকৃতির সঙ্গে এই লড়াই চলতে থাকল। কখনো মানুষ জিতে যায় কখনো প্রকৃতি।

আবার শুধু চাষ করলেও চলে না। পীর পীরানি বিবি গাজিরা শিখিয়েছেন ধান চাষ করা। কিন্তু বৃষ্টির জল ছাড়া মিষ্টি জল নেই কোথাও। তাই ধান চাষ করলে খাজনা দেওয়াই সার। শুরু হল চিংড়ির চাষ। যে বাঁধ ধানের জমি রক্ষা করে তাকেই কেটে জল ঢোকানো হল বিশেষ করে মাঘী পূর্ণিমার কোটালে। কলকাতার বাবুদের 'প্রন কাটলেট'-এর ব্যবস্থা হল কিন্তু বাঁধ আর জমি দুই বিপদগ্রস্থ হল। চিংড়ির জোগান দিতে বাঁধ গেল আর কাঠের জোগান দিতে কাটা হল বাদাবন— ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট।

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের মূলে এই বাদাবন। বাঘ-হরিণ-শুয়োর, কাঠ-মোম-মধু, মাছ-চিংড়ি-কাঁকড়া সব ধরে রেখেছে এই বাদাবন। এখনও সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ

বাদাবন। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে বাদাবনের এরিয়া ক্রমশ কমছে। মিষ্টি জলের অভাবে সুন্দরী গাছ এখন দেখাই যায় না। আরো বহু প্রজাতির ম্যানগ্রোভ লুপ্ত হয়েছে গত ১০০ বছরে। কিছুটা প্রাকৃতিক কারণে কমলেও বেশিটা কমেছে মানুষের অবহেলায় আর কুঠারের আঘাতে। অবশ্য আয়লা আমফানের সময় রুটিনমাফিক আক্ষেপ শোনা যায় সবার মুখে। আহারে। বাদাবন থাকলে জলের উচ্ছ্বাস কমতো। বাঁধগুলো রক্ষা পেত। নোনা জল ঢুকে চাষের জমি নষ্ট করত না। তার চেয়ে বড়ো কথা ঝড়ের গতিবেগ কমলে কলকাতায় কম ক্ষতি হয়। গাছ পড়ে না, ল্যাম্প পোস্ট রক্ষা পায়। বাদাবন পারে গতি কমিয়ে দিতে বিশেষ করে ল্যান্ডফলে হাওয়ার গতি যদি পশ্চিম থেকে পুবের দিকে হয়। টিভিতে দেখছিলাম এনডিআরএফ কলকাতার রাস্তায় উপড়ে যাওয়া গাছের ডাল কাটছে। মনে হচ্ছিল— প্রকৃতির প্রতিশোধ।

তাই বলে এমন নয় যে কলকাতা সুন্দরবনের কষ্ট বোঝে না বা স্বার্থ দেখে না। ১৯৭৩ সালে রাজ্য সরকার সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি করেন এলাকার প্রতি বিশেষ নজর রাখতে। সেই বছরেই টাইগার রিজার্ভ তৈরি হয় ২৫০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে। ১৯৯৪ সালে সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর কাজ শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল সুন্দরবনে কর্মরত সরকারি এজেন্সিদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন এবং জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা করেও স্থানীয় মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করা। গরু মারিয়া জুতা দান বললে অত্যুক্তি হবে কিন্তু কাজের কাজ খুব একটা হয়নি। সরকারি ডিপার্টমেন্ট মানে হল জমিদারি। সমন্বয় কথাটা সবার অপছন্দ। সুন্দরবন দপ্তরে কাজ করতে গিয়ে সে কথা ভালোভাবে বুঝতে পারি।

কী মাছ পাওয়া যায় সুন্দরবনে? পার্শে, ভেটকি, ভোলা ভেটকি তো বটেই ট্যাংরা, কই, বাঁশপাতা, সমুদ্রের দিকটায় বোয়াল, পাঙ্গাস, তপসে, চিংড়ি। আপনার ছেলের বিয়েতে যদি ক্যানিং থেকে চিংড়ি না এল তাহলে আপনি কেউকেটা নন। ছোটো ছোটো অসংখ্য ডিঙ্গিতে স্বামী-স্ত্রী সকালে এসে জাল ফেলবে। সারা দিন কাটবে ডিঙ্গিতেই। সন্ধ্যায় জাল গুটিয়ে মাছ তুলে নিয়ে বাড়ি। কী পেলি রে? জিজ্ঞেস করলে বলবে কিছুই পেলাম না বাবু। অভিজ্ঞতা থেকে জানে সরকারি অফিসার মানেই ডাকাত। একদিন দেখলাম একজন সত্যি কিছু পায়নি। গোটা পনেরো পার্শে মাছ। কত নিবি? দশ টাকা দেন বাবু। আমি বলছি ২০০৫/০৬ সালের কথা। জোর করে বেশি দিলাম বলে আমার মাঝিদের ঘোর আপত্তি। একবার এক বুড়ি তো কেঁদেই ফেলল। দারিদ্রের অত করুণ মুখ কোনো ভালো সিনেমাতেও দেখিনি।

সমন্বয়ের গুরু দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে সুন্দরবন দপ্তর তার নিজের কাজটা মন দিয়ে করত। ইটের রাস্তা তৈরি যার উপর দিয়ে ভ্যান রিকশা ছুটবে। আমাদের রাস্তা আর পঞ্চায়েতের রাস্তায় দেখেই তফাত করা যেত। পঞ্চায়েতের ইট শোয়ানো। আমাদের ইট সাইডের উপর খাড়া করে পাতা। আমাদের ইটের সংখ্যা বেশি তাই রাস্তা হত শক্তপোক্ত। খাবার জলের নলকূপ লাগানো হত শ'য়ে শ'য়ে। খরচ হত বেশি কারণ ৪০০ ফুটের কমে মিষ্টি জল পাওয়া যেত না। সুন্দরবনে আমাদের তৈরি কংক্রিট জেটির সুনাম ছিল। কান্তি গাঙ্গুলি মন্ত্রী হয়ে কাজের গতি ও ব্যাপ্তি বাড়িয়ে দিলেন। দপ্তরকে রাজি করালেন মাতলার উপর ব্রিজ তৈরি করতে। রোজ সকালে স্থানীয় মহিলারা নৌকো থেকে নামেন এক হাঁটু কাদায়। ঘাট থেকে ক্যানিং স্টেশন সেখান থেকে শিয়ালদা। মহিলাদের কষ্ট লাঘব করা হল কয়েকশো কোটি টাকার ব্রিজ তৈরি করে। অমিতাভ ঘোষের বইয়ে পড়েছি সকালের সেই ট্রেনের নাম ছিল ঝি-স্পেশাল। এখন যদি তিনি বলেন আমি তো নাম দিইনি তাহলে মেনে নিতেই হবে।

একের পর এক ছোটো বড়ো ব্রিজ তৈরি করা হল। নেহাত পয়সা ছিল না তাই। না হলে সাগর আর কাকদ্বীপ জুড়ে দেওয়া হত ব্রিজ দিয়ে। তবে মুরিগঙ্গায় টাওয়ার বসিয়ে বিদ্যুতের লাইন নেওয়া হয়েছিল সাগরে। তুষার কাঞ্জিলাল ছিলেন ব্রিজের ঘোর বিরোধী। পরিবেশের বইবার ক্ষমতা সীমিত। তাছাড়া নদীকে বাধা দিলে সে কোথায় গিয়ে ভাঙ্গন ধরাবে তার ঠিক আছে? একই কারণে বিরোধী ছিলেন ইট-কংক্রিটের বাঁধের। নদীর ব্যাপারে তুষারবাবু পক্ষপাতী ছিলেন হল্যান্ডের রিভার অথরিটির মতো একটি সংস্থা গঠন করার। তা আর হয়ে ওঠেনি। সুন্দরবনের বাঁধের জন্য সেই সময়ে জমি অধিগ্রহণ করা হত না। মানুষ স্বেচ্ছায় জমি দিতেন। অধিগ্রহণ চালু হতে ক্ষতিপূরণ হয়ে দাঁড়াল একটা বড়ো সমস্যা।

কেন্দ্রীয় সরকার সুন্দরবনকে কোস্টাল নিয়ন্ত্রণ বিধির ১ নম্বর জোনে ফেলেছে। অনেক লড়াই করে কয়েক লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছুটা ছাড় আদায় করা গেছে না হলে কোনো কাজই করা যেত না। যে কাজটা সত্যিই ভালো করা যায় তা হল ট্যুরিজম বা ইকো-ট্যুরিজম। স্থানীয় মানুষের উপার্জন বাড়ে। দেশ-বিদেশের মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের দিগন্ত বিস্তৃত হয় স্কিল বাড়ে কাজের নতুন সুযোগ তৈরি হয়। ট্যুরিস্টরাও উপকৃত হন কম না। গোসাবার বাজারে মাছ কেনা সাগরের বাজারে চা আর তেলেভাজার সঙ্গে আড্ডা মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা।

সুন্দরবনকে যত শক্ত করেই বাঁধো না কেন বিশ্ব উষ্ণায়নের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে। সমুদ্রের তাপমাত্রা বাড়ছে। জলের স্তর বাড়ছে। নিউ ইয়র্ক, টোকিও থেকে শুরু করে মুম্বাই কলকাতা অনেক শহরই বিপদে পড়বে। সুন্দরবন বরঞ্চ একটু

নিরাপদ কারণ বাঁধ তো দেওয়াই আছে। উচ্চতা বাড়িয়ে গেলেই হবে। কিন্তু বিপদের কথা যে সমুদ্রের তাপ বাড়লে ঝড় ঝঞ্ঝা সাইক্লোনের সংখ্যাও বাড়বে, তীব্রতাও বাড়বে। সুন্দরবন কি পারবে নিজেকে রক্ষা করতে? বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্ট বলছে এখন থেকেই ভাবতে হবে সুন্দরবনবাসিকে অন্যত্র সরিয়ে নেবার কথা। এখনও পর্যন্ত নদীগর্ভে জমি হারিয়ে ঘরছাড়া হয়েছেন হাজার দশেক মানুষ। কিন্তু এই সংখ্যা বাড়বে। কেউ কেউ মনে করেন সুন্দরবনের ৫০ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে ১৫ লক্ষ মানুষকে পুনর্বাসন দিতে হবে। কোথায় যাবেন এঁরা? গিলগিট, বালটিস্তান না আকসাই চিন?

এগুলো কোনো কাজের কথা নয় কারণ বড়ো সংখ্যায় মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাবার রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ক্ষমতা আমাদের নেই। অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পেরেছি? পারিনি। সুন্দরবনে বিভিন্ন সময়ে মানুষ এসেছেন বহু দিক থেকে। একটা বড়ো সংখ্যা নিয়ে আসে জমিদার। ৫০-এর মন্বন্তরে আসেন অনেকে আর বহু মানুষ আসেন বাংলাদেশ থেকে। এই স্রোত কমেছে কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়নি। যারা কলকাতায় চাকরি পেয়েছেন শহরতলিতে ফ্ল্যাট কিনতে পেরেছেন তাঁরা চলে এসেছেন নিরাপদ জায়গায়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে সুন্দরবনের কত মানুষ কাজ করেন? লকডাউনে ঘরে ফিরলেন ক-জন? সমীক্ষায় দেখা গেছে পাঁচটা বাড়ির এক বাড়ির লোক কাজের খাতিরে বাইরে থাকেন তবে রাজ্যের মধ্যে কত আর ভিন রাজ্যে কত তার হিসেব নেই। এই সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়ানো যায় এবং এদের উপার্জন ক্ষমতাও বাড়ানো যায় ঠিকমতো ট্রেনিং দিয়ে। দিল্লি হরিয়ানায় প্লাম্বারের যত কাজ সব উড়িষ্যার ছেলেদের হাতে। সোনার গয়না মানেই বাঙালি।

আমাদের একটা স্কিম খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কৃষকের জমির চার ভাগের এক ভাগে পুকুর কেটে মাছ ছাড়া। সেই মাটি কাজে লাগিয়ে উঁচু বাঁধ দিয়ে কলাগাছ ইত্যাদি লাগানো। বাকি জমিতে ধানচাষ। জানি না সেই পুকুরগুলো আছে কিনা। আমফানের ঝড়ে পুকুরে নোনাজল ঢুকল কিনা। কিন্তু একদিকে ঝড় সামলাবে অন্যদিকে কাজের সুযোগ তৈরি করবে একাজ করবে কেন? পঞ্চায়েত অকেজো পরিত্যক্ত। ঝড়ের সময়ে বিভাগীয় মন্ত্রীর দেখা পাওয়া যায় না। বিডিও সাহেব করবেন এই কাজ? বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। দশ বছর আগে আয়লা যে ভাঙচুর করেছিল তার মেরামত হল কোথায়? যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন তাঁদের ক্ষতিপূরণ হয়েছে? বিশ্ব ব্যাঙ্কের সমীক্ষা সে কথা বলছে না।

ছবি : সুরজিৎ সরকার

“আত্মনির্ভর ভারত”?

শাশ্বত

বালিগঞ্জ প্লেস নিবাসী মিতালি ঘোষের খুনের তদন্ত করতে গিয়ে শবর ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র ঘাঁটছেন। সেই সময় নানাবিধ তথ্যের মাঝে তাঁর সহকারি (জগবন্ধু স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র) ভাঙা সেন্টের শিশির প্রসঙ্গে বললেন, “সবকটা ‘ফরেন’ স্যার”। শবর শুধরে দিয়ে বললেন, “কথাটা ‘ইম্পোর্টেড’।” শবর শেষ পর্যন্ত খুনিকে ধরেছিলেন। কিন্তু ঘটনাটা সপ্তদশ শতকের ইউরোপ হলে খুনের থেকে বড়ো অপরাধ হয়তো হত ওই ‘ইম্পোর্টেড’ সুগন্ধিটির ব্যবহার। চারদিকে তখন মারকেন্টাইল তত্ত্বের ঢক্কানিনাদ বাজছে। নিজের দেশের উন্নতি করতে গেলে রপ্তানি বাড়াও এবং আমদানি কমাও, আর তাই কেবল দেশীয় পণ্য ভোগের সঙ্কল্প নাও। এই চিন্তার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন এক ইংরেজ বণিক থমাস মুন (আদতে নিজেদের আখের গোছাতেই এত কাণ্ড— শ্রেণিস্বার্থ)। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ময়দানে নামলেন অ্যাডাম স্মিথ (*দ্য ওয়েলথ্ অফ নেশনস্*, ১৭৭৬)। ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় আত্মপ্রকাশ করলেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি, ডেভিড রিকার্ডো (*প্রিন্সিপলস্ অফ পলিটিকাল ইকোনমি অ্যান্ড ট্যাক্সেশন*, ১৮১৭)। দুজনেই বুঝিয়ে দিলেন— যদি দেশের সম্পদ বাড়াতে চাও তাহলে প্রাণ খুলে (মারকেন্টাইলিজম্ ভুলে) আমদানি এবং রপ্তানি দুই-ই কর। বাকিটা? যা হয় আর কি, ইতিহাস।

চলে আসা যাক বিংশ শতকের মাঝামাঝি। ইতিমধ্যে হয়ে গেছে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ, গ্রেট ডিপ্রেশন, রাশিয়ান বিপ্লব ইত্যাদি। সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষ তার পরাধীনতার ইতিহাস মাথায় রেখেই আত্মনির্ভরশীলতায় মনোনিবেশ করল নেহরুর (এইরে!) তত্ত্বাবধানে। শুধু ভারত নয়, তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশ তদ্দিনে হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গিয়েছিল যে মুক্ত বাণিজ্যের অছিলায় তাদের ভাঁড়ে মা ভবানি করে আবার নিঃস্ব করে ছেড়ে দেবে প্রথম বিশ্ব যদি তারা ওদের উপর অর্থনৈতিকভাবে বড্ড বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালে জার্মানির হান্স সিঙ্গার এবং আর্জেন্টিনার রউল প্রেবিশ পৃথকভাবে প্রমাণ করলেন যে উন্নত দেশের সঙ্গে অনুন্নত দেশের বাণিজ্যের শুরুতে অনুন্নত দেশ একই পরিমাণ রপ্তানির বদলে যতখানি আমদানি করতে পারে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণ কমতে থাকে। অর্থাৎ অনুন্নত দেশের জন্যে আমদানির দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং উলটো দিকে উন্নত দেশের জন্যে তা কমতে থাকে কারণ তৃতীয় বিশ্ব মূলত কাঁচামাল এবং প্রাথমিক (কৃষিজ) দ্রব্য রপ্তানি করে ও প্রথম বিশ্বের থেকে সে মূলত শিল্পসামগ্রী আমদানি করে। ওদিকে প্রথম বিশ্বের দুনিয়ায় তখন জন মেইনার্ড কেইন্সই শেষ কথা। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত *দ্য জেনারেল থিওরি* নামের যুগান্তকারী গ্রন্থে তিনি জানান যে মুক্ত বাজার ধনতন্ত্র সর্বদাই সংকটমুখী এবং বেকারত্বের সমস্যা মেটাতে অক্ষম। তাই সরকারকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে দেশের সামগ্রিক চাহিদা বহাল থাকে। এতে উৎপাদনও লাভজনক হবে আর লোকের কর্মসংস্থানও হবে। তৃতীয় বিশ্বে রাষ্ট্র-পরিকল্পিত আত্মনির্ভরশীলতা আর প্রথম বিশ্বে ওয়েলফেয়ার স্টেট। দ্বিতীয় বিশ্বে কী হচ্ছিল সেটা বাঙালি জাতিকে আলাদা করে স্মরণ করাতে হবে না।

কিন্তু ‘চক্রবৎ পরিবর্তন্তে’। ১৯৭০-এর দশক থেকেই প্রথম বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মিল্টন ফ্রিডম্যান আসর জমাতে শুরু করেন। তাঁর মতে সরকার বেশি নাক গলিও না, ঢাক বাজিয়ে গোটা বিশ্বে মুক্তাবাজার-অব্দ শুরু করা হোক। ‘বাকি সব অব্দ মুছে ফেল’। কিন্তু তাতে যে অনেক কিছুই এসে গেল, কেউ কেউ বলছে নাকি ‘করোনা’-ও। ১৯৮০-র দশকে মার্গারেট থ্যাচার (তৎকালীন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী) এবং রোনাল্ড রেগানের (তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট) শাসনকাল থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমল অব্দি প্রভূত ভয়াবহ এবং বিধ্বংসী গোলমাল সত্ত্বেও তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক মসনদে বহাল আছে ‘নিওলিবারালিজম্’। সাধারণ মানুষের কাছে যিনি ‘মুক্ত বাজার’, ‘বিশ্বায়ন’ ইত্যাদি নামে পরিচিত। ভারত এই মুক্ত বাজার ব্যবস্থাকে আলিঙ্গন করেছে ১৯৯১ সালে। বাকিটা? ওই যা হয় আর কি, ইতিহাস।

এক্ষণে একটি সরল অঙ্কের অবতারণা আবশ্যক। দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে সামগ্রিক চাহিদার বৃদ্ধি

আবশ্যিক। দেশে উৎপাদিত দ্রব্যের সামগ্রিক চাহিদার উৎস দুটি— দেশের বাজারে চাহিদা (ডোমেস্টিক ডিম্যান্ড) এবং বিদেশের বাজারে চাহিদা (রপ্তানিকৃত দ্রব্যের চাহিদা)। বিশ্বায়নের যুগে গোটা পৃথিবী জুড়েই বেকারত্বের সমস্যা প্রকট হয়েছে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে গেছে। মুক্ত বাজারতন্ত্রের মতে 'চাপ নেবেন না। বৈষম্যের ফলে দেশের লোকের হাতে বেশি টাকা না থাকলেও আর তাই ডোমেস্টিক ডিম্যান্ড বেশি না হলেও বিদেশের বাজারের চাহিদা সবটা সামলে নেবে। অর্থাৎ, রপ্তানি চালিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি'।

করোনার প্রকোপে গোটা বিশ্বেই এখন অর্থনৈতিক ভরাডুবি। সুতরাং বিশ্বের বাজারের উপর বেশি ভরসা করাটা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। এদিকে ভারতে প্রায় দু-মাস ব্যাপী লকডাউনের ফলে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মন্দার দুশ্চিন্তা এখন করোনার ভয়াবহতার থেকে কোনো অংশে কম নয়। স্বাভাবিকভাবেই এহেন পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক হাল ফেরাতে আত্মনির্ভরশীলতার আবেদন জানিয়েছে মোদী সরকার। হোয়াটস্অ্যাপ ইউনিভার্সিটিও ইতিমধ্যে প্রচারকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু মুক্তবাজারের যজ্ঞে 'আত্মনির্ভরশীলতা'-র মন্ত্র বিয়ের অনুষ্ঠানে শ্রাদ্ধের মন্ত্রোচ্চারণের সমতুল। আসল সমস্যা তো ভূতপুষ্ট সর্ষেতেই।

বিগত ঊনত্রিশ বছরে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার এবং বৈষম্য দুই বেড়েছে। বেশিরভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এবং ভালো চাকরি খুব বেশি না বাড়ার ফলে শিল্প-পণ্যের দেশীয় বাজারের আয়তনও আশানুরূপ নয় (ভারতের আর্থিক বৃদ্ধিও পরিষেবা নির্ভর)। ভারতের এলিট শ্রেণির ভোগব্যয়, পুঁজিপতিদের বিনিয়োগ এবং বিদেশের বাজারে ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদার উপর জিডিপি-র বৃদ্ধি তাই বহুলাংশে নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় ভারতের সাম্প্রতিক (করোনা-পূর্ব) অর্থনৈতিক (বে)হাল করোনার এবং লকডাউনের প্রভাবকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই কয়েক মাসের ভোগান্তিতে থমাসের মতামত তাই আবার সামনে এসেছে বোঝা যাচ্ছে— 'আত্মনির্ভরশীলতা'। কোভিড বাবাজি ডেভিড রিকার্ডোকে ব্যাকসিটে পাঠালেন কিনা সেটা সময় বলবে। কিন্তু ফ্রিডম্যানধর্মী বল্গাহীন মুক্তবাজারি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং অধুনা কেন্দ্রীয় সরকারের বাক্যমনাতীত পারদর্শিতার ফলে আমরা যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে আত্মনির্ভরশীলতার সাফল্যের সম্ভাবনাটা খতিয়ে দেখা দরকার। আত্মনির্ভরশীলতা বলতে গোদা বাংলায় 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' (যদিও মা এখন আর দীন-দুখিনী নাই)। কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে— ১. অনুপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে অন্যান্য দেশগুলিও তাদের মায়ের দেওয়া মোটা বা পাতলা কাপড়, সফ্টওয়্যার, পাথর, ইত্যাদি মাথায় তুলে নিতে পারে। ভারতের রপ্তানির ১৮ শতাংশ এবং ১৬ শতাংশ সঙ্গে যুক্ত যথাক্রমে নর্থ আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, করোনা যাদের অভাবনীয় ক্ষতি করেছে। সুতরাং তারাও যদি একই মন্ত্র জপে, তাহলে ভারত আরো চাপে। ২. ভারতের পরনির্ভরশীলতার কারণগুলির অন্যতম হল মিনারেল পণ্য (৩০-৩২ শতাংশ), নানাবিধ মেশিন এবং তাদের অংশ, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ইত্যাদি (২০-২২ শতাংশ)। এই সমস্ত বিষয়ে চাইলেই আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায় না। তাহলে এতদিনে হয়েও যেতাম। এইসব সামগ্রীর অনেক কিছু আবার দেশের উৎপাদনকে ত্বরান্বিতও করে। ৩. মোটা কাপড় দেশে বানানো হলেও তার মুনাফা দেশের জাতীয় আয়ের অংশ হবে না যদি উৎপাদক বিদেশি কোম্পানি হয়। তাহলে এখন সর্বসন্তাপনাশিনী এফডিআই সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে? ৪. তিন দশক ধরে জাতীয় আয়ের ক্রমবর্ধমান অংশ যে এলিট শ্রেণির হস্তগত হয়ে চলেছে 'ইম্পোর্টেড' পণ্যে তাঁদের আগ্রহই বেশি। বহু সাধনার ফল এই গ্লোবাল আত্মপরিচয়ের আত্মরতিবর্ধক ভোগবাদ। কেবল ২০ লক্ষ কোটির ঘোষণার ফাঁকে ২০ বার 'আত্মনির্ভর' লোকাল টনিক ঢেলে দিলে সেই ভোগের ইচ্ছেকে বাদ দেওয়ানো যাবে না।

এক বিয়ে বাড়িতে সদ্য আলাপ হওয়া অভিমন্যুকে তন্নিষ্ঠা কথাপ্রসঙ্গে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে 'তোমার পারফিউম ফ্যাক্টরি আছে?' অভিমন্যু সকৌতুকে সম্মতিসূচকভাবে বলে যে সেই 'কারখানায়' তাঁকে নিয়ে তিনজন শ্রমিক এবং দুজন মেশিন (খাঁটি এমএসএমই)। সে পারফিউমের নাম আর বাজারে তা পাওয়া যায় কিনা জানতে চাওয়ায় অভিমন্যু উদাস দৃষ্টিতে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে বলে 'চিনবে না। শোনোনি। তোমরা সব বিদেশি পারফিউম ব্যবহার করা লোক।' 'রুরাল বেল্টে' বেচে বলে সে পারফিউমের গন্ধ চড়া (দাম নয়)। তন্নিষ্ঠার শ্রেণির মানুষেরা অনেক বেশি, ভেবলেনের ভাষায়, প্রদর্শনমূলক ভোগে মগ্ন (যদিও তন্নিষ্ঠা ব্যতিক্রমী)। অভিমন্যুর সেই 'রুরাল বেল্টের'-ই একজন মানুষ হলেন আত্মারাম। কলকাতা শহরে তিনি পরিযায়ী শ্রমিক। এনারাই ভারতের সিংহভাগ, যাদের রোজগারও অনিশ্চিত এবং ক্রয়ক্ষমতাও তথৈবচ। বেশিরভাগ আয় এবং সম্পদ মুষ্টিমেয়র করায়ত্ত বলে আজ দেশের হাল বেহাল। এক্ষণে আপামর জনসাধারণের থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডোমেস্টিক ডিম্যান্ড পেতে গেলে তাঁদের উপার্জন বাড়াতে হবে। উপার্জন বাড়াতে গেলে তাঁদের কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে এবং তাঁদের প্রকৃত আয় বাড়াতে হবে। অথচ একের পর এক রাজ্য বলে দিচ্ছে কোনোরকম শ্রমিক আইন মানা হবে না।

মজুরদের আগে যারপরনাই খাটানো হত এখন যারঘরনাই (তাঁদের সত্যিই ঘর/অন্যত্র ঠাঁই নাই) খাটানো হবে। মজুরির বৃদ্ধি আরো কমে যাবে। এমনিতেই বেশিরভাগ শ্রমিক এসবের আওতায় আসেও না। যে কয়জন আসত তাঁদের জীবনেও এগুলো এখন ইতিহাস হয়ে যাবে। স্বভাবতই সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় বাড়বে না। আয়ের অভাবে মায়ের দেওয়া কাপড় মাথায় তুলে পুজো করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকবে না। আমরা জেনেছি যে উৎপাদকদের (যেমন এমএসএমই-দের) প্রচুর ঋণ দেওয়া হবে। উত্তম প্রস্তাব। অভিমন্যুরা পর্যাপ্ত ঋণ পেলেও তাঁদের পণ্য কিনবে কে? আত্মারামদের পকেট বা লুঙ্গির গোঁজ তো ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি। এরপর আর অ-করোনিয় স্মরণীয় মন্দা ঠেকায় কে? আত্মারাম 'গরিব আদমি আছে'। ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করতে গেলে আত্মারামদের দারিদ্র্যের খাঁচাছাড়া করতেই হবে। এক্ষণে মিল্টন ফ্রিডম্যানকে ছেড়ে কেইন্সকে না ধরলে অভিমুণ্যর বোতল বিক্রি বাড়ানোটা আষাঢ়ে স্বপ্ন।

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

মোদী সরকার বনাম প্রকৃতি ও আদিবাসী

সমর বাগচী

গত ১৬ মে ভারতের অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের পূর্ব ও মধ্য ভারতের ঝাড়খণ্ড, ছত্তিসগড়, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশের ৪১টি কয়লার ব্লক নিলাম করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার মধ্যে ঝাড়খণ্ডে, ছত্তিসগড়ে এবং উড়িষ্যাতে নটি করে, মধ্যপ্রদেশে এগারোটি এবং মহারাষ্ট্রে তিনটি ব্লক। প্রধানমন্ত্রী মোদী টেলিভিশনে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে জানিয়েছেন যে জাতীয় স্বার্থে এইসব ব্লক ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং সেটা আগে যে ভুল করা হয়েছে তাকে শোধরাবার জন্য এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। পূর্বতন সরকারের কয়লা শিল্পকে সংযত করবার জন্য যেসব সংরক্ষণ আইন-কানুন ছিল তার বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। তিনি জানান যে এখনি ভালো সময় যখন ভারত পৃথিবীর এক প্রধান রপ্তানিকারক দেশ হবে। তাই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কয়লা খোলা বাজারে বিক্রি হবে। মোদীর ভাষায় এটা হচ্ছে 'আত্মনির্ভরতার অভিযান'। কোভিড অতিমারির সুযোগ নিয়ে 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ার ছলনা করছেন বর্তমান বিজেপি সরকার। যে কয়লা ৪৭ বছর সরকারের কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের হাতে ছিল তাকে লাভের জন্য ধূর্ত, মিথ্যা শ্লোগান দিয়ে দেশী-বিদেশী কর্পোরেট সেক্টারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এমন সব অঞ্চলকে যা হচ্ছে ধনী সম্পদ সম্পন্ন 'No Go' অঞ্চল।

এই লুঠের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ২০১৫ সালের Coal Mines (special provisions) Act এবং ১৯৫৭ সালের Mines and Minerals (Development and Regulation) Act-কে পরিবর্তন করা হয় প্রথমে ২০২০ সালের জানুয়ারিতে অর্ডিন্যান্স জারি করে এবং মার্চ মাসে, যখন কোভিড ছড়াচ্ছে, তখন সংসদে Mineral Laws (Amendment) Act লাগু করিয়ে। আগে এইরকম ভঙ্গুর অঞ্চলে খনি খননে ও নিলামে অংশগ্রহণে যেসব বাঁধা নিষেধ ছিল সেসব সরিয়ে নেওয়া হয় যাতে কয়লার নিলামে সহজে অংশগ্রহণ করা যায় এবং বিশ্বপুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে। সত্যি কথা বলতে কী মোদী সরকার ২০১৯ সালেই কয়লা উৎপাদন, প্রসেসিং এবং বিক্রয়ে ১০০ শতাংশ এফডিআই করার অনুমতি দেয়।

যেভাবে নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে মোদী সরকার এইসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা থেকে আমরা বুঝতে পারি সরকারের প্রান্তীয় মানুষদের এবং বাস্তুতন্ত্রের প্রতি কীরকম অবহেলা এবং কর্পোরেট পুঁজির সঙ্গে কীরকম আঁতাত। এছাড়া, আমাদের সংবিধানে পঞ্চম সিডিউলে আদিবাসীদের জন্য যেসব নিরাপত্তা অধিকার দেওয়া হয়েছিল তাকে পদদলিত করেছে মোদী সরকার। যেমন :

- ২০০৬ সালের The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act বা সংক্ষেপে FRA। এটি পূর্বতন সরকারের একটি অতি প্রগতিশীল আইন।
- ১৯৯৬ সালের The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled areas) Act (PESA)।
- ১৯৮৬ সালের The Environment Protection Act এবং ২০০৬ সালের EIA Notification।
- ২০১৩ সালের Right of Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act

এই সমস্ত প্রান্তীয় মানুষ ও পরিবেশ বান্ধব আইন কানুন কংগ্রেস আমলে প্রবর্তিত হয়েছিল যদিও তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করত না কংগ্রেস সরকার। কয়লার ব্লককে নিলামে দেওয়ার মোদী সরকারের এই যে একতরফা সিদ্ধান্ত তা সুপ্রিম কোর্টের নানা রায়ের বিরোধী। যেমন:

- ১৯৯৭ সালের ১১ জুলাই Samata Vs State of Andhra Pradesh and Others-এর রায়ে বলা হয়

যে যদি তারা চায় তাহলেই একমাত্র আদিবাসী কোঅপারেটিভের অধিকার আছে তাদের জমিতে খনি খনন করার।

- ২০১৩ সালের ১৮ এপ্রিলের Orissa Mining Corporation Ltd. Vs Ministry of Environment and Forests (Niyamgiri Judgment)-এর রায়ে তাদের জমিতে খনি খনন করা যাবে কিনা সে ব্যাপারে গ্রাম সভার সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে সাংবিধানিক অধিকার তা বজায় রাখে।
- ২০১৩ সালের ৪ জুলাই Thressiamma Jacob & Others Vs Geologist Department of Mining-এর মামলায় তিন বিচারক রায় দেয় যে জমির নীচে যে সম্পদ আছে তার মালিক হচ্ছে জমির মালিক।
- ২০১৪ সালের ২৫ আগস্ট Manoharlal Sharma Vs Principle Secretary & Others (Coalgate Case) মামলায় তিন বিচারকের বেঞ্চ যায় দেয় যে কয়লা হচ্ছে 'জাতীয় সম্পত্তি' তা কেবল সর্বসাধারণের মঙ্গল এবং জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে।

কয়লার ব্লককে নিলামে তোলার কথা যখন জানা গেল তখন প্রতিটি প্রদেশের আদিবাসী ও স্থানীয় মানুষ প্রতিবাদে সামিল হল। যেমন :

- ছত্তিসগড়ের হাসদেও আরান্দ অঞ্চলের কুড়িটি গ্রাম সভা, যারা ২০১৫ সাল থেকে কয়লাখনির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল তারা, প্রধানমন্ত্রীকে লিখল নিলাম বন্ধ করতে। হাসদেও আরান্দ হচ্ছে মধ্য ভারতের ১৭,০০০ হেক্টারের(হেঃ) সবচেয়ে বৃহৎ অরণ্য অঞ্চল। হাতিদের বিচরণের এক প্রধান করিডর এবং গোন্ড আদিবাসীদের বাস এই অরণ্যে। রাজ্যের ফরেস্ট মিনিস্টার কেন্দ্রের পরিবেশ মন্ত্রী প্রকাশ জাভদেকারকে চিঠি দিয়েছেন যে হাসদেও আরান্দ, মান্ড নদী এবং লেমুর হস্তি সংরক্ষণ অঞ্চল (1195 sq. km. অরণ্য)-এর কয়লার ব্লকগুলোর যেন কোনো নিলাম না করা হয়। করা হলে বহু আদিবাসী গোন্ড জীবন ও জীবিকা হারাবে এবং হাতি ও মানুষের মধ্যে সংঘাত বাড়বে।
- ঝাড়খণ্ডে তিনটি প্রতিষ্ঠান— ঝাড়খণ্ড জনধিকার মহাসভা (JJM), ঝাড়খণ্ড নাগরিক প্রয়াস (JNP) এবং দলিত আদিবাসী শক্তি অধিকার মঞ্চ (DASAM) কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের রাজ্য সরকার শর্ত সাপেক্ষে কয়লার ব্লকের নিলাম সমর্থন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছে ছয় থেকে নয় মাস নিলাম বন্ধ রাখতে যাতে সামাজিক সাম্যভিত্তিক ও টেকসই প্রাকৃতিক সাম্যভিত্তিক উন্নয়ন ঘটে। সুপ্রিম কোর্টে আবেদনে রাজ্য সরকার বলেছে, 'need of fair assessment of social and environmental impact on the huge tribal population and vast tracts of forest lands which are likely to be adversely affected'। রাজ্য সরকার আবেদনে আরো জানিয়েছে যে ২০২০ সালের ১৩ মার্চ যে Land Amendment Act লাগু করা হয়েছে তাতে ষাট দিনের মধ্যে নিলাম কার্যকারী করার যে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ১৪ মে সেই সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই নিয়ম মাফিক নিলাম আর হতে পারবে না। মুখ্যমন্ত্রী আরো জানিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত 'Co-operative Federalism'-এর বিরুদ্ধে যায়। রাজ্য সরকারের আবেদনের যে দুর্বলতা তা আমি পরে আলোচনা করবো। এখানে বলে রাখা দরকার যে মহারাষ্ট্র এবং ছত্তিসগড় সরকার তাদের অঞ্চলের কয়লার ব্লকের নিলাম সরাসরি বাতিল করে দিয়েছে।
- উড়িষ্যার নয়টি কয়লা ব্লক নিলাম হবে যার আটটি আছে আঙ্গুল জেলায় যেখানে বহু বছর ধরে ক্ষতিকর খনি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ তালচের-আঙ্গুল অঞ্চলকে 'Critically Polluted Areas' বলে ঘোষণা করেছিল। এই কয়লার ব্লকগুলো ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত এবং তার কাছেই আছে উড়িষ্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী ব্রাহ্মণি। ওই অঞ্চলে যদি খনির কাজ চলে তাহলে তার বাস্তুতন্ত্রের আরো অবনতি ঘটবে, মানুষ তাদের জীবন ও জীবিকা হারাবে এবং নদী ও খাল ব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বংস হবে।
- মহারাষ্ট্রের বান্দের-তালোদা অঞ্চলে, যেখনাকার কয়লার ব্লক নিলাম করা হবে, ৮০ শতাংশ অরণ্য অঞ্চল। এই অঞ্চল অত্যন্ত বাস্তুতন্ত্রে সংবেদনশীল বাঘের বাসস্থান ও করিডোর। কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডও এই অঞ্চলের স্টাডি থেকে জানাচ্ছে যে অঞ্চলটি বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকে খুবই সংবেদনশীল। মহারাষ্ট্র সরকার সরাসরি এই প্রকল্পের বিরোধিতা করেছে এই প্রকল্পের বিরাট ক্ষতিকর প্রভাবের জন্য।
- মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার গোতিতোরা কয়লার

ব্লকের ৮০ শতাংশ অরণ্য আচ্ছাদিত। ওর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় সিতারেওয়া নদী। আগে থেকেই সিংরাউলি ও চিন্দওয়ারা অঞ্চলের মানুষেরা আন্দোলন করছে পুনর্বাসননের দাবিতে ও দূষণের বিরুদ্ধে। এইসব অঞ্চলের গ্রাম সভা নিলামের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জোর জবরদস্তি করে জমি অধিগ্রহণ, বেআইনিভাবে খনির লিজ পুনর্নবীকরণ করা, দুষণ এবং মর্মন্তুদ পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ আন্দোলন করছে। এটা কিছু আশ্চর্যের নয় যে আদিবাসী অধ্যুষিত এই তিনটি রাজ্য কয়লার নিলামের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছে। তার কারণ স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত ৭৩ বছরে তথাকথিত উন্নয়নের যূপকাষ্ঠে প্রায় ১০ কোটি মানুষ জীবন ও জীবিকা হারিয়েছে যার মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ (১২ শতাংশ) কয়লাখনি ব্যবস্থার জন্য এবং ৭০ শতাংশ বাস্তুহারা হয়েছে আদিবাসী। পুনর্বাসন হয়েছে মাত্র ২৫ শতাংশের। পাঞ্চেত বাঁধ নির্মাণের পর যারা উচ্ছেদ হয়েছিল তাদের আমি দেখেছি হত দরিদ্র অবস্থায় উদ্‌বোধনের বহুদিন পরে বাঁধের ধারে বাঘমারা-শিউলিবারি গ্রামে। বহুদিন আগে সমাজকর্মী মেধা পাটকার আমাকে অনুরোধ করেন ডিভিসি অফিসে খবর নিতে ডিভিসি-এর বাঁধের জন্য কত মানুষ বাস্তুহারা হয়েছে। আমি ৩ দিন ডিভিসি লাইব্রেরীতে অনুসন্ধান করি। ডিভিসি-এর প্রথম বাৎসরিক রিপোর্টে পাঞ্চেত বাঁধের উদ্‌বোধনের খবর ছিল। পণ্ডিত নেহেরু উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি বুধনি শবরকে দিয়ে বাঁধ উদ্‌বোধন করান। সেদিন কেন্দ্রীয় এক মন্ত্রী গ্রামবাসীদের বলেন পাঞ্চেত বাঁধের ফলে তাদের জীবনে বিরাট উন্নতি নেমে আসবে। এই কথা পড়ে আমার হাসি পাচ্ছিলো বাঘমারা-শিউলিবাড়ির কথা ভেবে।

মোদী সরকার আমাদের সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে এবং রাজ্যের মানুষের ও প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন কীভাবে হবে তাতে রাজ্য সরকারের অধিকারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এইসব কয়লার ব্লককে নিলাম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিলাম করার সিদ্ধান্তের এক সপ্তাহের মধ্যে তিনটি রাজ্যের প্রতিবাদ থেকে খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের অস্তিত্বকেই মানতে চায়নি।

প্রধানমন্ত্রী স্বপ্নের ফানুশ উড়িয়েছেন কয়লার উৎপাদনের নতুন কর্মকাণ্ড নিয়ে। তিনি দাবি করেছেন যে কয়লার উৎপাদনকে ব্যবসাদারদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়ার ফলে রাজস্ব আদায় বাড়বে, ২.৮ লক্ষের বেশি লোক কাজ পাবে, আগামী ৭ বছরে ৩৩,০০০ কোটি টাকার পুঁজি বিনিয়োগ হবে এবং কয়লার উৎপাদন ও পরিবহণের জন্য ৫০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে। কিন্তু, এই কাজে যে সামাজিক ও পরিবেশের ক্ষতি হবে তা অবর্ণনীয়। খনি খনন থেকে তার শক্তি কেন্দ্র পর্যন্ত এবং তার পরে পয়লার ছাইয়ের পরিবহণের জন্য কয়লার যে জীবনচক্র তা বাস্তুতন্ত্রে ধ্বংস ডেকে আনবে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে যে কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোয় তা বিশ্বতাপ বৃদ্ধি করে ও জলবায়ুর পরিবর্তন এনে বিপর্যয় ডেকে আনে। তাছাড়া, উন্নয়নের এই যূপকাষ্ঠে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবন ও জীবিকা হারায়। ১৯৯২ সালে ভারতের উন্নয়নের ধ্বংসের খরচ (Environment Degradation Cost) প্রকাশ করেন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের (WB) দু-জন বিজ্ঞানী। এই রিপোর্ট সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের (CSE) *ডাউন টু আর্থ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে জানা যায় যে ভারতের পরিবেশের ধ্বংসের খরচ হচ্ছে বছরে ৩৪,০০০ কোটি টাকা যা তদানীন্তন জিডিপি-এর ৪.৫ শতাংশ। CSE সেই রিপোর্ট নিয়ে গবেষণায় দেখে যে পরিবেশের বেশ কিছু ধ্বংসের খরচ ওই রিপোর্টে ধরা হয়নি। সেগুলো হিসেবে আনলে ধ্বংসের খরচ দাঁড়ায় বছরে ৫০ থেকে ৭০ হাজার কোটি টাকা। যা হচ্ছে সেই সময়ের জিডিপি-এর ৭ থেকে ৯ শতাংশ। অর্থাৎ, আমরা যদি জিডিপি-তে ৪ থেকে ৫ শতাংশ ওপরে উঠি তাহলে পরিবেশের ধ্বংসের খরচে দেশ নেমে যাচ্ছে। ভারতের ২৫ কোটি ধনী ও মধ্যবিত্তের আগ্রাসী ভোগবাদী জীবনের জন্য এই ধ্বংস হচ্ছে। এর প্রভাব এখনই আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু, পুরোপুরি বুঝতে পারবে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা। তাদের বাঁচবার অধিকার বর্তমান সভ্যতা কেড়ে নিচ্ছে। তাই, সুইডেনের ষোড়শী গ্রেটা থুনবারগ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যদের ধমকাচ্ছে 'How dare you create such a world for us'।

এইসব কয়লার ব্লক আছে ভঙ্গুর বাস্তুতান্ত্রিক (ecological) এলাকায় যেখানে আছে গভীর অরণ্য ও নানা জীবপ্রজাতি। এইসব অঞ্চলে বাস করে অরণ্যবাসী আদিবাসী মানুষ। এখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি উৎপাদন করছে ভারত। কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড তাদের Vision-2030-তে এবং সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটি জানাচ্ছে যে আগামী দশ বছরে আর নতুন কয়লাখনির কোনো প্রয়োজন নেই। এমন সময়ে চটজলদি কর্পোরেট সংস্থার হাতে লাভের জন্য দেশের সম্পদ তুলে দিতে চান স্বপ্নের জাদুকর নরেন্দ্র মোদী। দেশে কয়লার প্রয়োজন হয় ইস্পাত, সিমেন্ট এবং সার ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য। এই সময়ে এই অতি প্রয়োজনীয় জাতীয় সম্পদ রপ্তানী করার সিদ্ধান্ত খুবই ভুল। তাছাড়া, আদিবাসী অধ্যুষিত সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্রের বাইরেও কয়লার অস্তিত্ব আছে। দেশের জন্য কয়লার যেটুকু সত্যিকারের প্রয়োজন হবে তা ওইসব অঞ্চল থেকেও উৎপাদন করা যাবে।

এছাড়া, আজ বেশিরভাগ পশ্চিমী দেশ কয়লা জ্বালিয়ে শক্তি

উৎপাদন কমিয়ে দিচ্ছে। সৌর এবং বায়ু শক্তির ব্যবহার বিরাট ভাবে বাড়ছে। এর ফলে বিদেশে কয়লা রপ্তানী করার সুযোগ খুব একটা নেই। কারণ, জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের ফলে বিশ্বতাপ বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। যার ফলে সুমেরু ও উত্তর অক্ষাংশের ভূগর্ভস্থ চিরহিমায়িত অঞ্চল (Permafrost) গলে যাচ্ছে, কুমেরুর বরফের পাহাড় ভেঙে পড়ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হচ্ছে, তাপলবনীয় সংবহন (Thermohaline Circulation) ধীরগতি হয়ে যাচ্ছে, জীবপ্রজাতি বিলুপ্ত হচ্ছে দ্রুত হারে, ওজোন স্তরে ক্ষয় ঘটছে, মাটি ক্ষয়ে নদী ও সমুদ্র বক্ষে জমা হচ্ছে, বিরাট আকারে জমি উষর হচ্ছে, মরুভূমির প্রসার হচ্ছে, বায়ু-জল ও সমুদ্র দূষিত হচ্ছে, বর্জ্যের পাহাড় জমা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, যে গালফ স্ট্রিম তাপ লবনীয় সংবহনের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব তাপমাত্রায় ভারসাম্য আনে, তা গত ১৫০ বছর ধরে ধীরগতি হচ্ছে। ২০১৮ সালের আগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্র সঙ্ঘের সেক্রেটারি জেনারেল জানাচ্ছেন, "We face existential threat. Climate change is moving faster. If we do not change our course by 2030 we risk missing the point where we can avoid a runaway climate change, with disastrous consequences"।

প্রকৃতি ভেঙে পড়ছে। ২৩ জুন আমার কাছে মেল এসেছে তাতে ছবি দেখাচ্ছে যে ইতালির আল্পসে এক বিরাট হিমবাহর গলন কমানোর জন্য তাকে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা হচ্ছে। যখন পারমাফ্রস্ট এবং সুমেরু বরফ গলে যায় তখন তার নীচে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যে মিথেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড জমা আছে তা বেড়িয়ে আসবে। মিথেন কার্বন ডাই অক্সাইডের চেয়ে ২০ গুণের বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস। তা বিশ্বতাপ বৃদ্ধি তরান্বিত করবে। মানুষ যত কার্বন উৎপন্ন করে তার প্রায় ২৫ শতাংশ সমুদ্র শোষণ করে। বিশ্বতাপ বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের ওই কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়িয়ে এসে পৃথিবীকে আরো উত্তপ্ত করবে। ফিড ব্যাক লুপ শুরু হয়ে বিশ্বতাপ হু হু করে বাড়বে। অথচ, তৃতীয় বিশ্বের ভারত, চিন ইত্যাদির মতো দেশ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাড়িয়েই চলেছে উন্নয়নের মরীচিকার পেছনে দৌড়ে। কিছুদিন আগে স্ট্যানফোর্ড, বারক্লে এবং প্রিন্সটনের বিজ্ঞানীদের বিবৃতি পেলাম যে ষষ্ঠ গণবিলুপ্তি আসছে এবং যে প্রজাতি সর্বপ্রথমে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে তা হচ্ছে মানব প্রজাতি।

প্রধানমন্ত্রী যেদিন কয়লার ব্লক নিলাম করার কথা ঘোষণা করলেন ঠিক তার পরের দিন কেন্দ্রীয় আর্থ সায়েন্স মন্ত্রালয় 'Assessment of Climate Change over the Indian Region'-এর প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ করে। ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে যে ১৯০১ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে আমাদের দেশের গড় তাপমাত্রা ০.৭ ডিগ্রি লেসিয়াস বেড়ে গেছে এবং এই শতাব্দীর শেষে তাপমাত্রা ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। আগেই বলা হয়েছে যে এই তাপ বৃদ্ধি ফিড ব্যাক লুপ সৃষ্টি করে বিশ্বতাপ হু হু করে বাড়িয়ে দেবে যাকে আর নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। বিশ্বতাপ বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তন পৃথিবীকে ধ্বংসের কিনারায় এনে ফেলবে। তাই, সারা পৃথিবীতে দাবি উঠছে জীবাশ্ম জ্বালানীকে মাটির নীচে থাকতে দাও।

মহারাষ্ট্র ও ছত্তিসগড় যেভাবে কয়লার ব্লক নিলামের পুরোপুরি বিরোধিতা করেছে ঝাড়খণ্ড সরকার কিন্তু সেরকম করেনি। সুপ্রিম কোর্টে ঝাড়খণ্ড সরকারের আপিল থেকে মনে হচ্ছে কতগুলি শর্ত মানলে নিলাম করা যাবে। এটি বলছে না যে ঝাড়খণ্ডে কয়লাকে মাটির নীচেই রাখতে হবে পরিবেশ, অরণ্যবাসী আদিবাসী মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য। সরকার ২,৫০০ কোটি টাকার রাজস্ব এবং ৫০,০০০ মানুষের কাজের সংস্থানের স্বপ্ন দেখছে। এটি ভাবছে না যে বর্তমান শিল্প ব্যবস্থায় স্থানীয় শ্রমিকের প্রয়োজন খুবই কম। তাছাড়া, পরিবেশের ধ্বংস ও অরণ্যবাসী মানুষের বাসস্থান ও জীবিকা হারাবার কথাও ভাবতে হবে।

এই যে কর্পোরেট বান্ধব, জাতীয়তা বিরোধী কয়লা খনন তার বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করতে হবে। এটি আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই হিন্দুত্ববাদী কর্পোরেট বান্ধব বিজেপি সরকার সংস্কারের নামে দেশের কৃষি, কয়লা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বহুবিধ সেক্টর দেশি ও বিদেশি ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সামান্য যেটুকু 'Welfare state'-এর ধারণা কংগ্রেস সরকার লাগু করেছিল তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করছে। আর এরাই ভারতের নাম করা বুদ্ধিজীবীদের জাতীয়তা বিরোধী বলে জেলে ঢোকাচ্ছে। তাদের এই জাতীয়তা বিরোধী কার্যক্রম লাগু করার জন্য যে সমস্ত সংরক্ষণমূলক আইন কানুন কংগ্রেস আমলে ছিল, যেমন বিদ্যুৎ, শ্রমিক, পরিবেশ, জমি, অরণ্যের অধিকার, স্থানিক শাসনের অধিকার ইত্যাদি, সেসব শিথিল করা হচ্ছে বা বাতিল করা হচ্ছে।

আজ, ভারতের সমস্ত খেটে খাওয়া শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের এবং সমস্ত পার্টির, যারা সঙ্ঘ পরিবারের বিরোধী, তাদের একত্রিত হওয়া সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক, কর্পোরেট পুঁজির দাস বিজেপি পার্টির কবল থেকে দেশকে মুক্ত করা।

এলআইসি— দেশের গর্ব

চন্দ্রশেখর বসু

সংসদে পেশ করা ২০২০-২১ অর্থবর্ষের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার এলআইসি-র শেয়ার বাজারে বিক্রি করার প্রস্তাব পেশ করেছে।

অতীতে দেশের জীবনবিমা ব্যাবসা দেশি-বিদেশি বেসরকারি মালিকানাধীন ছিল। 'বোম্বে মিউচুয়াল' ১৮৭১ সালে ভারতবর্ষে প্রথম জীবনবিমা ব্যাবসা শুরু করেছিল। 'ওরিয়েন্টাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি' ১৮১৮ সালে দেশে প্রথম বিমা ব্যাবসা চালু করলেও ১৮৩৪ সালে দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৭৪ সালে কোম্পানিটি পুনরায় জীবনবিমা ব্যাবসা শুরু করে। বিমা ব্যবসায় যেহেতু অত্যন্ত কম মূলধন বিনিয়োগ করে প্রচুর আর্থিক সম্পদের মালিক হওয়া যায় তাই দেশের ব্যাঙ্ক-বিমা ব্যাবসার প্রাকজাতীয়করণ পর্যায়ে শিল্পপতিরা ব্যাঙ্কিং ব্যাবসার সঙ্গে সঙ্গে বিমা ব্যাবসার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। (টাটা গোষ্ঠী, নিউ ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া, ডালমিয়া, ভারত ইনস্যুরেন্স, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি)। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে জমা হওয়া দেশবাসীর অর্থ বস্তুত মালিকদের স্বার্থেই ব্যবহৃত হত। উভয় ব্যাবসার ক্ষেত্রেই গ্রাহকদের সঞ্চিত অর্থ তছরূপ হওয়া, মালিকদের ভ্রষ্টাচার ও দুর্নীতির ফলে কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া এগুলি ছিল সেই সময়কালের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

পঞ্চাশের দশকে ভারতে ব্যাবসারত ২৫টি বেসরকারি জীবনবিমা কোম্পানি যখন সম্পূর্ণ দেউলিয়া, আরো ২৫টি দেউলিয়া হবার পথে এবং ষাট হাজারের বেশি গ্রাহক সর্বস্বান্ত তখন দেশবাসীকে স্তম্ভিত করে ১৯ জানুয়ারি ১৯৫৬ রাত্রি ৮টার সময় তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করে দেশের জীবনবিমা ব্যাবসাকে জাতীয়করণ করেছিল। সেই সময়কালে সংসদকে এড়িয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করা ইদানীং কালের মতো অহরহ ঘটে যাওয়া ঘটনা ছিল না বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল এবং সরকারকে সংসদে জবাবদিহি করতে হত। তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ সংসদে জবাবদিহি করার সময় বলেছিলেন যে অর্ডিন্যান্স জারি না করে কালক্ষেপ করলে মালিকরা কোম্পানির তহবিল অন্যত্র সরিয়ে ফেলত। অর্ডিন্যান্স জারি করার পরের দিন ২০ জানুয়ারি সরকারের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত ৪২টি জিম্মাদারী সংস্থা দেশের ২৪৫টি বেসরকারি জীবনবিমা কোম্পানির সম্পদকে অধিগ্রহণ করে। (১৫৪টি দেশীয় ও ১৬টি বিদেশি কোম্পানি এবং ৭৫টি প্রভিডেন্ট ফান্ড সিকিউরিটিস)।

দেশের জীবনবিমা ব্যাবসা জাতীয়করণের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর সঞ্চয়ের নিরাপত্তা ও এই অর্থ দেশ গঠনে ও সমাজের কল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যবহার করা। এলআইসি গঠনের উদ্দেশ্য, তার সুদীর্ঘ সাড়ে ৬৩ বছরের কর্মকাণ্ড ও বর্তমান আর্থিক অবস্থা সংক্ষিপ্ত পরিসরে অনুধাবন করে কেন্দ্রীয় সরকারের শেয়ার বিক্রির প্রস্তাবটির বিচার বিবেচনা করা উচিত।

মাত্র ৫ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ এলআইসি যাত্রা শুরু করেছিল। প্রসঙ্গত মালিকদের ভ্রষ্টাচার ও দুর্নীতির কারণে সরকারকে গ্রাহকদের ৭০ লক্ষ টাকা ভরতুকি দিতে হয়েছিল। ১৯৯৯ সালে এনডিএ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার দেশি-বিদেশি বেসরকারি পুঁজিকে ভারতে বিমা ব্যবসায় অনুপ্রবেশের পুনরায় সুযোগ করে দেয়। যেহেতু আইন অনুযায়ী এই বেসরকারি কোম্পানিগুলির ন্যূনতম মূলধন ১০০ কোটি টাকা থাকতে হবে তাই আইনের মান্যতা দিতে এলআইসি-র মূলধনও ১০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। গঠনের আইনে ছিল যে এলআইসি প্রতিবছর তার ব্যবসায়িক উদ্‌বৃত্তের ৫ শতাংশ সরকারকে দেবে ডিভিডেন্ট হিসেবে এবং বাকি ৯৫ শতাংশ অর্থ গ্রাহকদের দেবে বোনাস হিসেবে (পরবর্তীকালে এলআইসি সংশোধনী আইন ২০১১ অনুযায়ী বর্তমানে এই হার যথাক্রমে ১০ ও ৯০ শতাংশ)। সম্প্রতি কেবলমাত্র ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের অর্থাৎ এক বছরের ডিভিডেন্ট হিসেবে এলআইসি সরকারকে দিয়েছে ২৬১০.৭৪ কোটি টাকা। এখনও পর্যন্ত কেবলমাত্র এই খাতে দেশের সরকারগুলি পেয়েছে ২৬,০০৫.৩৮ কোটি টাকা।

৩১.০৩.২০১৯ তারিখের হিসেব অনুযায়ী এলআইসি-র মোট সম্পদের পরিমাণ ৩১,১১,৮৪৭.২৮ কোটি টাকা। লাইফ

ফান্ড ২৮,২৮,৩২০.১২ কোটি টাকা, ১৯৫৬ সালে যা ছিল মাত্র ৪৪০ কোটি টাকা। মোট গ্রাহক সংখ্যা ৪০.৭০ কোটি (ব্যক্তিগত ২৯.০৯ কোটি ও গোষ্ঠীগতভাবে ১১.৬১ কোটি) যা ১৯৫৭ সালে ছিল মাত্র ৫৫ লক্ষ।

গঠনের সংসদীয় আইন অনুযায়ী এলআইসি মোট বিনিয়োগের ন্যূনতম ৭৫ শতাংশ অর্থ সরকারি ক্ষেত্রগুলিতে অর্থাৎ দেশের পরিকাঠামোতে ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে এলআইসি ৮১.৭৫ শতাংশ অর্থ বিনিয়োগ করেছিল সরকারি ক্ষেত্রে এবং ১৮.২৫ শতাংশ অর্থ বিনিয়োগ করেছিল 'ইক্যুইটি ও প্রেফারেনসিয়াল শেয়ার'-এ। ৩১.০৩.২০১৯ তারিখের হিসেব অনুযায়ী এলআইসি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে উন্নয়ন খাতে দিয়েছে ১৮,৭৯,০৭৯ কোটি টাকা। এছাড়াও সামাজিক ক্ষেত্রের ২,৬১,০২৭ কোটি টাকা বিনিয়োগকে যুক্ত করে অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সহ এলআইসি দেশের উন্নয়নে মোট বিনিয়োগ করেছে ২৯,৮৪,৩৩১ কোটি টাকা। দেশের অস্থির আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যেও ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে কেবলমাত্র 'ইক্যুইটি' বিক্রি করে ২৩,৬৫৬ কোটি টাকা লাভ করেছে। এই অর্থবর্ষে মোট ব্যবসায়িক উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ ৫০,০০০ কোটি টাকা।

দেশের সুদীর্ঘ গৌরবজনক স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের স্বয়ম্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের চাকার বিপরীতমুখী আবর্তন শুরু হয়েছে নব্বই-এর দশক থেকে। ১৯৫৬ সালের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়ে তোলার শিল্পনীতিকে বিসর্জন দিয়ে ১৯৯১ সালে দেশের পরিবর্তিত শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারিকরণ সহ দেশি-বিদেশি ব্যক্তি পুঁজি নির্ভর আর্থ-সামাজিক নীতি গৃহীত হয়েছে। তারপর থেকে চলেছে আর্থিক সংস্থা সহ দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলি ধ্বংসের প্রক্রিয়া। রেহাই পায়নি এলআইসি-ও। আক্রান্ত হয়েও, দেশের জীবনবিমা ক্ষেত্র উন্মুক্ত হবার প্রায় দু-দশক পরেও এবং মুনাফা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত না হয়েও এলআইসি তার ব্যবসায়িক শ্রীবৃদ্ধিকে অটুট রেখেছে। ৩১.০৮.২০১৯ তারিখের হিসেব অনুযায়ী ২৩টি বেসরকারি জীবনবিমা কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রথম বছরের প্রিমিয়াম বাবদ আয় ও 'পলিসি' সংখ্যার নিরিখে দেশের জীবনবিমা ব্যাবসার বাজারে এলআইসি একাই যথাক্রমে ৭৩.০৬ শতাংশ ও ৭২.৮৪ শতাংশ বাজার দখল করে আছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে মৃত্যু ও মেয়াদজনিত দাবির ক্ষেত্রে গড়ে প্রায় ৯৬ শতাংশ সময়মতো নিষ্পত্তি করে পৃথিবীতে এক বিরল নজির সৃষ্টি করেছে।

দেশের জীবনবিমা ব্যাবসাকে জাতীয়করণ করে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যগুলি সম্পূর্ণ সফলভাবে রূপায়ণ করে চলেছে এলআইসি। দেশের বর্তমান সরকার এলআইসি-র শেয়ার বিক্রি করার অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটির ১০০ শতাংশ জাতীয় চরিত্রকে ধ্বংস করে দেশি-বিদেশি বেসরকারি পুঁজির অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেবার পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির বিষয়টি হাজির করেছে। এলআইসি প্রতি বছর তার ব্যবসায়িক হিসেব সংসদে পেশ করে। বেসরকারি পুঁজির পক্ষে সওয়ালকারীদের একজনও আজ পর্যন্ত স্বচ্ছতার প্রশ্নে এলআইসি-র বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনতে পারেননি। সরকারের কর্তাব্যক্তিরা বলছেন যে শেয়ার বিক্রি হলেও এলআইসি-র গ্রাহকদের প্রতি সরকারি আশ্বাস (Sovereign Guarantee) বহাল থাকবে। জাতীয়করণ আইনে সরকারের নিরাপত্তার আশ্বাস থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সরকারকে এলআইসি-কে বা তার গ্রাহকদের জন্য কোনো আর্থিক সাহায্য দিতে হয়নি বরং কোটি কোটি গ্রাহক পেয়েছে নিরাপত্তা ও সঠিক পরিষেবা এবং সরকারগুলি পেয়েছে কোটি কোটি টাকা যা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। তাই নিরাপত্তার আশ্বাসের বিষয়টি দুরভিসন্ধিমূলক।

এলআইসি-তে বেসরকারি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটলে গ্রাহকদের গভীর আস্থা আঘাতপ্রাপ্ত হবে যা দেশে ব্যাবসারত বেসরকারি জীবনবিমা কোম্পানিগুলিকে প্রতিযোগিতায় অতিরিক্ত সুযোগ প্রদান করবে। এখনই গ্রাহকদের দাবি নিষ্পত্তি ও পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। দেশের উন্নয়নে এই কোম্পানিগুলির বিনিয়োগও প্রায় নেই বললেই চলে। তাই এলআইসি-কে দুর্বল করার ও বেসরকারি কোম্পানিগুলির শক্তিবৃদ্ধির প্রস্তাব অবশ্যই দেশবিরোধী। বরং যেহেতু এলআইসি-তে প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতেই হয় তাই গ্রাহকস্বার্থে এলআইসি-র বিনিয়োগ দপ্তরের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। সরকারের অযথা হস্তক্ষেপ অবশ্যই অনভিপ্রেত।

আসলে কর্পোরেট স্বার্থে দেশের সরকার একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। এলআইসি-র শেয়ার বিক্রির বিষয়টিও এই প্রক্রিয়ার সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। বেসরকারি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটলে এলআইসি-র গ্রাহক পরিষেবা, স্বচ্ছতা ও সামাজিক বিনিয়োগ প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হবে। বেসরকারি পুঁজি পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির স্বচ্ছতা(!) ও পেশাদারিত্ব(!) আবারও প্রমাণিত হয়েছে 'ইয়েস ব্যাঙ্ক'-এর ক্ষেত্রে যাকে বাঁচাতে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক সংস্থাগুলির দ্বারস্থ হয়েছে। তাই এলআইসি-র শেয়ার বিক্রির সরকারি প্রস্তাব বেসরকারি জীবনবিমা কোম্পানিগুলির ও কর্পোরেট স্বার্থে যা জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থবিরোধী।

বদলে গেলেন কেজরিওয়াল

গৌতম হোড়

এককথায় বলতে গেলে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল এখন আর অ্যাক্টিভিস্ট নন, পুরোপুরি ছকে ফেলা রাজনীতিক হয়ে গিয়েছেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে কেজরিওয়ালের উত্থান প্রায় রূপকথার মতো। ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসের লোভনীয় চাকরি ছেড়ে নেমে পড়লেন সিভিল সোসাইটির আন্দোলনে। আন্না হাজারে তখন লোকপাল নিয়ে আন্দোলন করছেন। কেজরিওয়াল হয়ে উঠলেন তাঁর ডানহাত। কেজরিওয়ালের সঙ্গে একগুচ্ছ তরতাজা যুবক। সেই সময় ইউপিএ-২-এর বিরুদ্ধে একের পর এক কেলেঙ্কারির অভিযোগ আসছে। সবকিছুকে ছাপিয়ে ওপরে চলে এসেছে দুর্নীতির বিষয়। আন্নার আন্দোলন প্রবল হচ্ছে। এখনও মনে আছে, যন্তর মন্তরে বসে আছেন গান্ধিবাদী আন্না হাজারে। মোমবাতি হাতে করে গান গাইতে গাইতে মিছিল চলেছে ইন্ডিয়া গেটের দিকে। লোক আসছে তো আসছেই। একটা উন্মাদনা চারপাশে। যেন মনে হচ্ছে, দিন বদলের ডাক এসে গিয়েছে। অথচ, একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যেত, লোকপাল হলে দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যেত না। যে দুর্নীতি সরকারি ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে গিয়েছে, তা একটা লোকপাল কী করে দূর করে দেবে? তাদের হাতে তো কোনো জাদুদণ্ড নেই, যা একবার ঘুরিয়ে দিলেই দুর্নীতি শেষ হয়ে যাবে। পুলিশ ঘুষ খাবে না। সরকারি বাবু থেকে আমলারা সুবোধ বালক হয়ে যাবেন। যাবতীয় চুক্তিতে কাটমানি বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ, এই লোকপালের কথা বলে দেশের যুব সমাজকে আন্দোলিত করতে পেরেছিলেন আন্না হাজারে।

সে সময় তাঁর দু-পাশে দুজনকে দেখা যেত। অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং কিরণ বেদি। একজন এখন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, অন্যজন কেজরিওয়ালকে হারাবার জন্য বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লিতে বিজেপি-র মুখ হয়ে ভোটে লড়েছিলেন। কেজরিওয়ালের কাছে গো-হারা হেরে যাওয়ার পর তিনি এখন পুদুচেরির প্রো-অ্যাকটিভ লেফটেনান্ট গভর্নর। আন্নার আন্দোলন একসময় যা তেজি ঘোড়ার মতো দৌড়োচ্ছিল, ইউপিএ সরকারকেও অসহায় করে দিয়েছিল, তার কোনো নাম ও নিশান এখন নেই। আন্না দিল্লি এলে তাঁর পাশে একশো লোকও থাকে না। অনেক টালবাহানার পর লোকপাল গঠিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার ফলে দুর্নীতি কমেছে, এমন দাবি অতিবড়ো লোকপাল-সমর্থকও করবেন না। বস্তুত, লোকপাল আছে কি না, কে লোকপাল হয়েছেন, তিনি কী কী অভিযোগের বিচার করলেন, কতজন উচ্চপদস্থ আমলা বা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁর কাছে জমা পড়েছে, তিনি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে সম্পর্কে ভারতীয় মিডিয়ার বা সুশীল সমাজে কোনো আলোচনা হচ্ছে বলে অন্তত আমার চোখে পড়েনি।

কিন্তু দুর্নীতি বিরোধী অভিযান দুজনের রাজনৈতিক ফায়দা করে দিয়েছে। যেমন বোফর্স-বিরোধী আন্দোলন মান্ডার রাজা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-কে প্রধানমন্ত্রী করে দিয়েছিল, অন্ধ্রপ্রদেশে দুর্নীতি বিরোধী অবস্থানে ভর দিয়ে জনপ্রিয় সিনেমা অভিনেতা এনটিআর দল গঠন করার পর প্রথম নির্বাচনেই দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন, তেমনই ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন ও অবস্থান নরেন্দ্র মোদীকে কেন্দ্রে ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দিল্লিতে ক্ষমতায় এনে দিয়েছিল। কিন্তু এন টি রাম রাও, এম জি রামচন্দ্রনের মতো অভিনেতা-রাজনীতিকের সঙ্গে নাগরিক সমাজকে পাশে নিয়ে আন্দোলন করা প্রাক্তন আধিকারিক কেজরিওয়ালের ফারাকটা হল, তাঁর মতো দ্রুত কেউ মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেননি। রামচন্দ্রন তো প্রথম জীবনে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর আন্নাদুরাইয়ের সঙ্গে ডিএমকে-তে। সেখান থেকে আলাদা দল গঠন করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এনটিআর ১৯৮২ সালের ২৯ মার্চ তেলেগু দেশম গঠন করেন এবং ১৯৮৩ সালের ৯ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন কেজরিওয়াল। ২৬ নভেম্বর তিনি আম আদমি পার্টি গঠন করে তার আহ্বায়ক হলেন, রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। ২৮ ডিসেম্বর তিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। রাজনীতিতে প্রবেশের পর এমন দ্রুত কেউ মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেননি।

কেজরিওয়াল সম্পর্কে এই ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য সেই অ্যাক্টিভিস্ট কেজরিওয়ালকে মনে করিয়ে দেওয়া, তিনি তখন রাজনীতিতে নতুন হাওয়া নিয়ে এসেছেন। প্রথম দফায় কংগ্রেসের সমর্থনে মাত্র ৪৯ দিন ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু সেই ৪৯ দিন দিল্লিতে ঝড় তুলে দিয়েছিলেন। নিন্দুকেরা বলে সত্যি সত্যি পুলিশ ঘুষ নিতে ভয় পেত। বাজার থেকে বা অস্থায়ী দোকান থেকে পুলিশ ও পুরসভার লোক হপ্তা তুলত না। সরকারি বাবুরা ভয় পেতেন, কে মোবাইলে রেকর্ড করে তাঁদের দুর্নীতির ছবি আপলোড করে দেবে, তা হলেই সর্বনাশ। লোকের মনে হতে লাগল, সরকারি সিস্টেম বা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বা তাকে ভাঙার জন্য কেজরিওয়াল হলেন ব্যতিক্রমী চরিত্র। তাই তাঁর ওপর ভরসা রাখা যায়। তিনি অন্য রাজনীতিকদের মতো আপস করবেন না। হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বিরোধের রাজনীতি করবেন না। লোকের সুবিধা করে দেবেন। গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়াবেন। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি সহজ কথাটা সোজাসাপটা বলেন, যা বলেন, সেইমতো কাজ করার চেষ্টা করেন। তিনিই আসল আম আদমির প্রতিনিধি। এই ধারণার ফলে তৈরি হল আরেক ইতিহাস। সত্তর আসনের বিধানসভায় ৬৭টি আসনে জয়। দিল্লির রাজনীতিতে ঝড়ের সঙ্কেত। তখন আপের অস্থায়ী অফিস ছিল কনট প্লেসের হনুমান মন্দিরের পিছনের দিকে একটি বাড়িতে। সেখানে গিয়ে দেখেছি, প্রতিবেশী কেউ এক বস্তা আলু পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কেউ বা দূর থেকে এসে চাল, ডাল, দিয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণের রাজ্য থেকেও লোক আসছেন স্বেচ্ছাসেবক হতে। তাঁরা পরিবর্তন চান। এমনকী বিদেশ থেকেও ভালো চাকরি ছেড়ে লোকে চলে এসেছেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, সরকারি ব্যবস্থার পরিবর্তন চান তাঁরা। কেজরিওয়াল তাঁদের চোখে সেই আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন। দেখে মনে হচ্ছে, ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন যুগ শুরু হল।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন যে, আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস্, এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।' ক্ষমতায় আসার পর কেজরিওয়ালের পাঁচ বছরের শাসন সম্পর্কে এই কথাগুলো অনেকাংশে খাটে।

এই পাঁচ বছরে আমরা কী দেখেছি? কেজরিওয়ালের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছে। বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসার মতো তাঁর নিজের দলের বিধায়কদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার লোলুপতার জন্য অতি দ্রুত সারা দেশে আপকে বিস্তার করতে গিয়ে ডুবেছেন। যে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের কথা বলে তিনি দল গঠন করেছিলেন, প্রার্থী বাছাই করবেন বলেছিলেন, তার কিছুই অনুসরণ করেননি। ব্যবসায়ীকে রাজ্যসভার মনোনয়ন দেওয়ার প্রতিবাদে তাঁর দলের নেতা আশুতোষ শুধু যে রাজ্যসভার প্রার্থী হননি তাই নয়, শেষপর্যন্ত দল ছেড়েছেন। তার আগে দল ছেড়েছেন প্রশান্ত ভূষণ, যোগেন্দ্র যাদব, সন্তোষ হেগড়ে, ময়াঙ্ক গান্ধি-সহ একগুচ্ছ নেতা। কারণ, দলে কেজরিওয়ালের কথাই শেষ কথা, এটা তাঁরা মেনে নিতে পারেননি। ফলে কেজরিওয়ালের আপও আর পাঁচটা এক নেতা বা নেত্রীশাসিত আঞ্চলিক দলে পরিণত হয়েছে, যেখানে তাঁর কথাই আইন। যা যা বলেছিলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার উলটো কাজগুলো করেছেন তিনি। বিজেপি, কংগ্রেস ও একাধিক বিরোধী নেতাকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিযোগ করে, মানহানির মামলার মুখে পড়েছেন। তারপর তাঁদের কাছেই ক্ষমা চেয়ে মামলা মেটাতে হয়েছে। তাতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন কেজরিওয়ালের ছবিটা উজ্জ্বল হল না। বরং বোঝা গেল, অন্য রাজনীতিকদের মতো তিনিও প্রয়োজনে আপস করেন। করেই থাকেন। পাঞ্জাবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, তিনি খালিস্তানপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এক সময় উঠতে বসতে নরেন্দ্র মোদী তথা বিজেপি-র সমালোচনা করা কেজরিওয়াল, যখন বুঝলেন, তাঁর এইসব কথা লোকে নিচ্ছে না, তখন তিনি একেবারে চুপচাপ হয়ে গেলেন। শেষ দেড় বছর কাজের দিকে মন দিলেন।

তা হলে তারপরেও হইহই করে জিতলেন কী করে? এর বিশ্লেষণ এই পত্রিকায় আগের লেখাতে রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি বিনা পয়সায় যা দিচ্ছেন, তাতে গরিব ও মধ্যবিত্ত দিল্লিবাসীর মাসে হাজার কয়েক টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। দিল্লির মতো অর্থ-কেন্দ্রিক শহরে এটা কম বড়ো কথা নয়। তাছাড়া তাঁর ডানহাত বলে পরিচিত মনীষ সিসোদিয়ার কাজের ফলে দিল্লির সরকারি স্কুলের চেহারা ফিরেছে। গরিবের সন্তানরা ভালো শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। মহল্লা ক্লিনিকের কল্যাণে পাড়ায় পাড়ায় বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ এসেছে। বাসে মহিলারা বিনা পয়সায় চড়তে পারছেন। ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুত বিনা মূল্যে, জল কার্যত বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোয় নিরাপত্তা কিছুটা

হলেও বেড়েছে। ফলে বিজেপি ভোটের প্রচারকে হিন্দু-মুসলিমে পরিণত করার পরেও কেজরিওয়ালকে আটকানো যায়নি। কংগ্রেসের পুরো ভোট প্রায় তিনি নিয়ে নিতে পেরেছেন। বিজেপি বিরোধী ভোট ভাগ হয়নি। গতবারের তুলনায় মাত্র পাঁচটি আসন হারিয়েছেন তিনি। ৭০-এর মধ্যে ৬২ আসনে জিতে আবার মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছেন। এই কৃতিত্বকে কম করে দেখার কোনো কারণ নেই। বিশেষ করে বিজেপি-র পুরো সংগঠনের বিরুদ্ধে, মোদী-শাহের বিরুদ্ধে, বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁকে লড়তে হয়েছে। তারপরেও তিনি জিতেছেন। এভাবে পর পর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-কে আটকে দেওয়ার কৃতিত্ব খুব বেশি নেতার নেই। নবীন পট্টনায়েক পেরেছেন, তেলেঙ্গানায় কেসিআর পেরেছেন, ২০২১-এর ভোটে জিতলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পারবেন।

কেজরিওয়ালের বদলের মধ্যেও আশা ছিল, তাঁর ভিতরের অ্যাক্টিভিস্ট এখনও জীবিত। কিন্তু এবার ক্ষমতায় আসার পর পরপর দুটি এমন ঘটনা ঘটল, যা দেখে মনে হচ্ছে, কেজরিওয়াল সত্যিই পুরোপুরি রাজনীতিক হয়ে গিয়েছেন, অ্যাক্টিভিজমের ছিটেফোঁটাও তাঁর মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই।

দিল্লি নির্বাচনের প্রচারের শেষের দিকে কেজরিওয়াল বিজেপি-র কট্টর হিন্দুত্ব ও বিভাজনের কৌশলে সম্ভবত ভয় পেয়েই নরম হিন্দুত্বের রাস্তা নিয়েছিলেন। হনুমান মন্দিরে যাওয়া, হনুমান চালিশা পাঠের কথা বলা, শাহিনবাগ নিয়ে অবস্থান বদল করা, সে সবই তার সাক্ষী দিচ্ছে। প্রথমে সিসোদিয়া শাহিনবাগের আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু পরে কেজরিওয়াল তার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। কিন্তু তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে সেভাবে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু উত্তর-পূর্ব দিল্লির ভয়াবহ দাঙ্গার পর সেই প্রশ্নও উঠে গেল। দাঙ্গা হচ্ছে, প্রতিদিন তার তীব্রতা বাড়ছে, কেজরিওয়াল কী করছেন? তিনি বিবৃতি দিচ্ছেন। অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করছেন, এমনকী রাজঘাটে গিয়ে ধ্যান করছেন শুভবুদ্ধি ফিরে আসার জন্য, হিংসা থামার জন্য। দিল্লিতে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার তাঁর হাতে নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। কিন্তু তাই বলে তাঁর কী কোনো দায়িত্বই থাকে না? লোকে মারা যাচ্ছেন, বাড়ি পুড়ছে, দোকান লুঠ হচ্ছে। এই চরম ধ্বংসলীলার মধ্যে কেজরিওয়াল রাজঘাটে গিয়ে ধ্যান করছেন। অথচ, যাঁর কাছে শরণ নিয়ে তিনি নিজের সব দায়িত্ব ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করলেন, সেই মানুষটি দাঙ্গার মধ্যে যেতে ভয় পেতেন না। নির্ভয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারতেন, এই হিংসা বন্ধ কর। দেশ যখন স্বাধীন হচ্ছে, তখন গান্ধিজি বেলেঘাটায়। কলকাতার বীভৎস দাঙ্গা থামানোর জন্য। শেষপর্যন্ত তাঁর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে দুই পক্ষ। গান্ধিজির দর্শন, তাঁর কাজের পদ্ধতি আমরা মানতে পারি, নাও মানতে পারি, কিছু যায় আসে না, কিন্তু এই অকুতোভয় মানুষটি যেভাবে দাঙ্গা ও হিংসা থামাতে পথে নামতেন, তার সিকিভাগ চেষ্টা করতে এখন কোনো রাজনীতিককে আমরা দেখতে পাই কি?

কেজরিওয়ালও কিছু করলেন না। অথচ, প্রত্যাশা ছিল, তিনিই হিংসার কথা শুনে প্রথমে গিয়ে সদলবলে রুখে দাঁড়াবেন। হিংসা আটকাবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু সেই কেজরিওয়ালকে আমরা দেখতে পেলাম না। সাংবাদিকরা যদি সেখানে যেতে পারেন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যদি সেখানে যেতে পারে, তা হলে মুখ্যমন্ত্রী কেন পারেন না? শুধুই বিবৃতি দিয়ে দায় সারলে অন্য রাজনীতিকের সঙ্গে কেজরিওয়ালের ফারাক কোথায় রইল।

তবে তিনি একটা কাজ করছেন। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত, সর্বস্ব হারানো মানুষদের ত্রাণশিবিরে আশ্রয় দিয়েছেন। সেখানে তাঁদের সাহায্য করার জন্য দিল্লি সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কাজ করছে। মুস্তাফাবাদের ইদগাতে ত্রাণশিবিরে রাজ্য সরকারের বিভাগগুলি যথেষ্ট সক্রিয়। কিন্তু এখনও তাঁদের কাছে প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণের টাকা পৌঁছোয়নি। তীর্থের কাকের মতো এই টাকার অপেক্ষায় বসে আছেন আক্রান্তরা। যাদের ঘর জ্বলে গিয়েছে, কেউ স্বজনকে হারিয়েছেন, দোকান পুড়ে ছাই। পাঁচ, দশ মিনিটের নোটিশে গৃহহীন হয়ে আশ্রয় শিবিরে আসতে হয়েছে। তারা এখন আবার জীবন শুরু করতে চাইছেন। ক্ষতিপূরণ পেলে তাঁদের আবার স্বাভাবিক জীবনে ফেরার কাজটা সহজ হবে।

এরপর দ্বিতীয় অপ্রত্যাশিত যে কাজটা কেজরিওয়াল করলেন, সেটা হল, কানহাইয়া কুমারের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা করার অনুমতি দিলেন পুলিশকে। জেএনইউ-তে বক্তৃতার সূত্রে কানহাইয়ার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা করা হয়েছে। অথচ, এই অভিযোগ যখন আসে, তখন কেজরিওয়াল পুরোপুরি কানহাইয়ার পক্ষে। তাঁর ভাষণ শুনে তিনি মুগ্ধ। একের পর এক টুইট করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছেন। সেই কেজরিওয়ালই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কানহাইয়ার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলার অনুমতি দিয়ে দিলেন। তিনি নিঃসন্দেহে এটা জানেন যে, কানহাইয়া বিহারে জন-গণ-মন যাত্রা করেছিলেন। সেখানে ভিড় ভেঙে পড়ছিল। কানহাইয়াকে সামনে রেখে বিরোধীদের একটা জোটের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। মোট কথা, তিনি বিহারে জেডিইউ-বিজেপি জোটের সামনে বিপদের কারণ হয়ে উঠছিলেন। এই অবস্থায় দেশদ্রোহের অভিযোগে যদি কানহাইয়া গ্রেপ্তার হন, তা হলে তিনি ভোটের সময় কারান্তরালে থাকবেন। তিনি খুব বেশি হলে নিজে লড়তে পারবেন, কিন্তু

নেতৃত্ব দিতে পারবেন না। কেজরিওয়াল কী সেই পথটা প্রশস্ত করে দিলেন না? ওই যে, 'যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না। যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না... পরের চক্ষে ধূলিলেপন করিয়া আমাদের পলিটিকস।' কেজরিওয়ালের দলের পক্ষ থেকে কী-বা হল? এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়মমাফিক। তাই এই ধরনের সরকারি সিদ্ধান্ত প্রথম থেকেই নেওয়া হয়। পরের চোখে ধুলো দেওয়ার রাজনীতিটা ভালো করেই করায়ত্ত করেছেন কেজরিওয়াল।

তাঁর ভিতরের সেই অ্যাক্টিভিস্ট হারিয়ে গিয়েছে। কেজরিওয়াল পরিপূর্ণ রাজনীতিক হয়ে উঠতে পেরেছেন। সব কিছুই তিনি রাজনৈতিক লাভ-লোকসানের নিক্তিতে তুলে হিসেব করতে পারেন। তাই সিএএ, এনআরসি-র প্রবল বিরোধিতা করলেও শাহিনবাগকে সমর্থন করলেন না। তিনি রাজঘাটে গিয়ে ধ্যান করতে পারেন। কিন্তু গান্ধিবাদী পথে কেউ আন্দোলন করলে তাকে সমর্থন করতে পারেন না। তিনি এখন আগে দেখে নেন, কেউ তাঁকে হিন্দুবিরোধী বলার সুযোগ পাচ্ছেন না তো, কেউ তাঁকে দেশদ্রোহীদের মদত করার অভিযোগ করতে পারছে না তো। বিশ্বাস ও ভাবনার সঙ্গে কাজের ফারাক হয়ে যায় সেখানেই। কানহাইয়াকে আগে সমর্থন করে পরে ভোলবদল সেই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন। আদর্শের জন্য রাজনীতিতে এসেছিলেন কেজরিওয়াল। এখন কী তিনি রাজনীতির জন্য আদর্শর সঙ্গে সমঝোতা করছেন? ভবিষ্যৎ এই প্রশ্নের জবাব দেবে। তবে এই প্রশ্নটা তোলার সুযোগ কেন করে দেবেন কেজরিওয়াল? তাঁর প্রতি সাধারণ লোকের অনেক আশা ছিল, তার প্রতি সুবিচার করতে পারছেন কি তিনি? বিশ্বাস ভেঙে গেলে, শুধু বিনি পয়সায় সুবিধা দিয়ে বেশিদূর যেতে পারবেন কি তিনি?

এই প্রবন্ধ ভারত তথা দিল্লিতে কোভিড সংকট শুরু হওয়ার আগে লেখা। —সম্পাদক

ছবি : সুরজিৎ সরকার

লিওপোল্ড, কঙ্গো এবং বেলজিয়াম

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

ব্রাসেলসে লকডাউন চলছে। রাস্তায় মানুষজন নেই। গিন্নি গেছেন মিটিং করতে মাস্ক আর গ্লাভস পরে, ব্যাগে স্যানিটাইজার নিয়ে, গজগজ করতে করতে। পইপই করে বলে গেছেন যেন বাড়ি থেকে না বেরোই। কে কার কথা শোনে। আমার পছন্দের জায়গা রয়াল প্যালেসের উলটো দিকের পার্ক। সেখানে পৌঁছে রয়াল প্যালেসের সামনে দেখি পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কী ব্যাপার? কে বা কারা রয়াল প্যালেসের সামনে রাজা লিওপোল্ডের প্রতিমূর্তির হাতের রং লাল করে দিয়ে গেছে। লোকেরা বলছে (অবশ্য লোক বলতে জনা দশেক) এটা 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার'-ওয়ালাদের কাজ। এর আগেও নাকি একবার করেছিল, অবশ্য সেটা বছর দুই আগে। আর করেছিল যেসব কঙ্গোবাসীরা এখন ব্রাসেলসে থাকে, তারা। কারণটা অবশ্য একই। কঙ্গোর ওপর লিওপোল্ডের লোকদের অকথ্য অত্যাচার।

অকথ্য বলতে কী বোঝায়? সংখ্যায় বোঝাতে গেলে পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটি মানুষের মৃত্যু, আর যদি ছবি দেখতে চান তবে কঙ্গোর মিউজিয়ামে একটা ছবি আছে, একটা লোক কাঁদছে, তার সামনে তার পাঁচ বছরের মেয়ের কাটা হাত আর কাটা পা। চোখে দেখা যায় না। অপরাধ? লোকটা তার কোটা মতো রবার জোগাড় করতে পারেনি।

এটা অবশ্য পরে ফিরে এসে জানলাম। মন থেকে ব্যাপারটা মুছে ফেলার চেষ্টা করছি— পৃথিবীতে কি এমনিতেই কম দুঃখ? এমন সময় লিউভেন থেকে একজন পরিচিতের ফোন— 'দেখেছেন কী কাণ্ড হচ্ছে?'

—'আবার কী হল? এইমাত্র তো দেখে এলাম লিওপোল্ডের মূর্তির হাতে লাল রং করে দিয়েছে।'

—'আরে সে তো কিছু না। এখানে ছাত্ররা এমন হল্লা করেছে যে লিওপোল্ডের একটা আবক্ষ মূর্তি লাইব্রেরির সামনে রাখা ছিল, সেটাকে স্টোরেজ, প্রায় জঞ্জালের মধ্যে ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ।'

—'আর কোথায় কী হয়েছে জানতে পেরেছেন কিছু?'

—'অনেক জায়গায় হয়েছে শুনেছি। এন্টওয়ার্পে লিওপোল্ডের মূর্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে। টারভুরেন গিয়েছেন? আফ্রিকান মিউজিয়ামে?'

—'না, গত তিন-চার বছর ধরেই তো বন্ধ। তবে গত বছর খুলেছে বোধ হয়।'

—'কেন বন্ধ ছিল জানেন?'

—'পরিষ্কার জানি না।'

—'ওখানে ২৭৬টা কঙ্গোবাসীর প্রতিকৃতি ছিল। অবশ্য প্রতিকৃতি শব্দটা অতি ভদ্র। বাঘের বা ভালুকের ছালের মধ্যে ভুষো ভরে ট্যাক্সিডার্মি করা দেখেছেন তো? সেইরকম ওই লোকগুলোর ছাল ছাড়িয়ে তার মধ্যে ভুষো ভরে রেখে দিয়েছিল ওই রাজা লিওপোল্ড। নাম দিয়েছিল Human Zoo, অর্থাৎ মানুষের চিড়িয়াখানা। এই নিয়ে এত জলঘোলা হয়েছে যে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছে ওটা বন্ধ করতে।'

আমি নিজে তারপর আরো কয়েক জায়গায় দেখলাম লিওপোল্ডের মূর্তিতে আলকাতরা লাগিয়েছে, বা হাতে লাল রং লাগিয়েছে।

প্রশ্ন হল, কী এমন অত্যাচার করেছিলেন লিওপোল্ড? কেন না বেলজিয়ামে আসার পরেই দেখেছি লিওপোল্ড এটা, লিওপোল্ড সেটা, লিওপোল্ডের নাম সর্বত্র। রাজা লিওপোল্ড বেলজিয়ামকে ইউরোপের অন্যান্য দেশের সমান করে তুলতে চেয়েছিলেন। ঠিক কথা, কিন্তু তার দাম দিয়েছিল কারা? ওই নাম না জানা কঙ্গোর কালো মানুষগুলো। সংখ্যাটা ভুলে যাবেন না, পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটির মধ্যে।

কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যায়। এটাই যদি সত্য হয় তাহলে এতদিন কিছু হয়নি কেন? দুটো কারণ হতে পারে। প্রথম, বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনার (এটা অবশ্য সবে, গত বছর, তাও সংযুক্ত রাষ্ট্র বলার পর) পর প্রতিবাদটা অনেকটা কমে গিয়েছিল, আর দুই, বেলজিয়ামের রাষ্ট্রপ্রধান এখনও

লিওপোল্ডের বংশধর। এতদিন পরে, আমেরিকায় ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার, এই প্রতিবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পুরোনো ঘৃণা এবং বিদ্বেষ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

তবে এটা ভালোভাবে বুঝতে হলে একটু ইতিহাস ঘাঁটতে হবে। ১৮৮৪-৮৫ সালে বার্লিনে একটা অধিবেশন হয়েছিল। নাম ছিল বার্লিন ওয়েস্ট আফ্রিকা কনফারেন্স। তাতে ইউরোপের দেশ— 'গ্রেট পাওয়ার্স'-রা আফ্রিকাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। অধিবেশনে অংশ নিয়েছিল গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, পর্তুগাল এবং বেলজিয়াম। অন্যান্যরাও অবশ্য ছিল। যে ভাগাভাগি হল সেটা পরের ষাট বছর পর্যন্ত বলবৎ রইল।

এরইমধ্যে কঙ্গোর ব্যাপারটা একটু আলাদা। বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডকে (লিওপোল্ড-II) কঙ্গো দেশ তাঁর পার্সোনাল প্রপার্টি করে দিয়ে দেওয়া হল। বাকিগুলো সব কলোনি রইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়ার দরুন লিওপোল্ড নির্মমভাবে কঙ্গোকে নিজস্ব স্বার্থসাধনে কাজে লাগলেন। কঙ্গোর প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। তার মধ্যে সবথেকে লাভদায়ক ছিল রবার গাছ। পুরো দেশের লোককে কার্যত কীতদাস বানিয়ে, যেন-তেন-প্রকারেণ রবার এক্সট্র্যাক্ট করা হত। প্রত্যেকটা লোকের, মায় মহিলাদের এবং বাচ্চাদের পর্যন্ত কোটা করা ছিল, তা তারা খেতে পাক আর নাই পাক। এই রবার তারপর যেত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, তাদের শিল্পবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য। এবং লিওপোল্ডের অত্যাচার এই পর্যায়ে উঠেছিল যে, জনপ্রতিরোধে ১৯০৮ সালে বাকি ঔপনিবেশিক শক্তিরা বাধ্য হল লিওপোল্ডের হাত থেকে কঙ্গোর শাসনব্যবস্থা সরিয়ে, সেটা বেলজিয়ান গভর্নমেন্টের (বেলজিয়ান সংসদ) হাতে তুলে দিতে।

এখানে জেনে রাখা দরকার, লিওপোল্ড নিজে কোনোদিন কঙ্গো যাননি। এখানেও লিওপোল্ডের সঙ্গে অন্যান্যদের তফাত। তবে অত্যাচার সব ঔপনিবেশিক শক্তিই তো করেছে, তাহলে অন্যদের সঙ্গে লিওপোল্ডের তফাত কোথায়? তফাত দুটো কারণে। প্রথমটা হচ্ছে, ব্রিটেন, ফান্স এবং জার্মানি ইত্যাদি দেশ নিজেদের উপনিবেশগুলোকে অনেক অধিকার দিয়েছিল, যা লিওপোল্ড কোনোদিন করেননি।

আর দ্বিতীয় কারণ হল, শিক্ষাব্যবস্থা। ফ্রান্স, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশ, ইউরোপীয় ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করলেও, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা প্রায় দেয়নি। কঙ্গো সেখানে একেবারেই অন্যরকম। শিক্ষার ওপর তো পয়সা খরচ করতে হয়, আর তাতে লিওপোল্ড নারাজ। পুরো শিক্ষাব্যবস্থা চলে গেল মিশনারিদের হাতে। তারা কিছু প্রাইমারি স্কুল তৈরি করে সেখানে বাইবেল পড়াতে লাগল। ফল হল এই যে, ১৯০৮ সালে কঙ্গোতে ছিলেন ৫৮৭ জন মিশনারি, আর ওই চব্বিশ বছরে (১৮৮৪-১৯০৮) প্রাইমারি শিক্ষা পেয়েছিল ৪৬,০০০ ছাত্রছাত্রী। এটা যে কঙ্গোর জনসংখ্যার খুবই কম শতাংশ, সেটা আর বলে দিতে হয় না। আর মিশনারিরা ছাত্রদের বোঝাল যে আফ্রিকার কোনো ইতিহাস নেই, তাদের কোনো কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বলে কিছুই নেই। মিশনারিরা এই শিক্ষা দিত যে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা আফ্রিকার পক্ষে সবথেকে ভালো। এবং উচ্চশিক্ষা মানে চার্চের পাদ্রী হওয়া। এই কারণে, যে ক-জনের ইউরোপে গিয়ে উচ্চশিক্ষা নেবার মতো অবস্থা ছিল, তারাও ইউরোপ যেত না। মজার ব্যাপার হল, শাসনব্যবস্থা বেলজিয়ান গভর্নমেন্টের হাতে চলে যাবার পরও শিক্ষার কোনো উন্নতি হল না। বেলজিয়ান গভর্নমেন্টের বদ্ধমূল ধারনা ছিল যে আফ্রিকানরা উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত নয়।

১৯৫৪ সালে প্রথম একজন কঙ্গোর অধিবাসী ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেন। যেখানে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স নিজেদের উপনিবেশে ভালো শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল, সেখানে বেলজিয়ান গভর্নমেন্টের নীতি এটাই প্রমাণ করে যে, তারা উপনিবেশ শাসন করার প্রতি আগ্রহী ছিল না। তারা মিশনারিদের একটা মাসমাইনে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব থেকে হাত ঝেড়ে ফেলল। আসলে শুধুমাত্র নিজেদের রাজাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই তারা শাসনভার হাতে নিয়েছিল। আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না তাদের।

এর ফল কী? ১৯৬০ সালে যখন কঙ্গো স্বাধীন হল, তখন জনসংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ। তার মধ্যে ১৬ জন গ্রাজুয়েট। কোনো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার নেই। যেখানে অন্যান্য আফ্রিকান দেশে তাদের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তৈরি ছিলেন দেশের শাসনভার হাতে নেবার জন্য, সেখানে কঙ্গোতে কেউ ছিল না। ফলে কঙ্গোর মতো একটা দেশ, যেখানে অনেক জনজাতি-উপজাতি, অনেক ধরনের সংস্কৃতি, তার কোনো নেতাস্থানীয় লোক ছিল না যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কঙ্গো আশেপাশের সমস্ত দেশগুলোর শিকার হয়ে পড়ল। আর সোভিয়েত ঢুকে পড়ল রাষ্ট্রপ্রধান প্যাট্রিস লুমুম্বার হাত ধরে।

কঙ্গোর লোকেরা এসব কথা মনে রেখেছে। আজ প্রায় ৪৩,০০০ কঙ্গোর লোক বেলজিয়ামে থাকে। কিন্তু তাদের মনের রাগ যায়নি। লিওপোল্ডের স্মৃতির বিরুদ্ধে যে অভিযান চলছে তাতে তারাই এগিয়ে, এবং যুব সম্প্রদায়, তাদের সাদাই হোক কি কালোই হোক, তাদের সঙ্গে।

এর শেষ কোথায়? ব্রাসেলসে এর থন প্লাসে লিওপোল্ডের একটা বিরাট প্রতিকৃতি আছে, ঘোড়ার পিঠে। সেটার চতুর্দিকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি লেখা হয়েছে। 'খুনি', 'নো জাস্টিস

নো ফ্রিডম' এসব তো ভালো কথা! রাজার হাত তো লাল রঙ করাই হয়েছে— কঙ্গোর মানুষের রক্তে লাল। উলটোটাও আছে। অস্টেন্ড শহরে লিওপোল্ড টাকা ঢেলেছিলেন। লিওপোল্ডের সবথেকে বড়ো মূর্তি আছে ওই শহরে। সেটার তলায় লেখা, 'আরবদের দাসত্ব থেকে তাদের মুক্তি দেবার জন্য কঙ্গোর অধিবাসীরা লিওপোল্ডের প্রতি কৃতজ্ঞ।' মূর্তিটার একদিকে কঙ্গোর অধিবাসীরা থুতু ফেলে, অন্যদিকে অস্টেন্ড-এর ফিশিং কমিউনিটির লোকেরা— যাদের জন্য লিওপোল্ড অনেক খরচা করেছিলেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকিয়ে থাকে। প্রণাম করে বললেও কিছু কম বলা হয় না।

বেলজিয়ামের স্টেট সেক্রেটারি (শহর ও সংস্কৃতি) বলেছেন একটা বিতর্ক সভার আয়োজন করা হবে। বিষয় পুরো বেলজিয়াম থেকে লিওপোল্ডের প্রতিমূর্তি সরিয়ে ফেলা। বিতর্কসভায় যোগ দেবেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা, বেলজিয়ামে থাকা কঙ্গোর অধিবাসী, এবং ঐতিহাসিকরা। এতে কি লাভ হবে ভগবানই জানেন, কেননা এ তর্কের তো শেষ নেই, তার ওপর বেলজিয়ানরা, বিশেষত আগের প্রজন্মের লোকেরা, লিওপোল্ডকে প্রায় যীশুর পাশে বসিয়েছে।

এই প্রচণ্ড নির্যাতন, অত্যাচার, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ, এর কী কোনো ক্ষতিপূরণ হয়? এই কিছুদিন আগে বেলজিয়ামের প্রিন্সেস ম্যারি এসমেরালডা বলেছেন বেলজিয়ামের ক্ষমা চাওয়া উচিত, এবং সেটা শুধু প্রধানমন্ত্রী বা সরকার করলে হবে না, রাজবংশকেও ক্ষমা চাইতে হবে। খুব ভালো কথা। নোট করুন যে প্রিন্সেস কিন্তু কোনোরকম আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথা বলেননি। স্বাভাবিক। ওটা বলার এক্তিয়ার ওনার নেই। কিন্তু অন্তত বিষয়টা তুললে হয়তো পারতেন।

ব্রাসেলস শহরে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, মিউজিয়াম সব আছে। আমরা দেখে বলি, বাহবা, বাহবা, বাহবা, বেশ। এগুলি তৈরি করার জন্য কয়েক হাজার মিশ্র-রক্তের ক্রীতদাস নিয়ে আসা হয়েছিল। এদের মধ্যে অনেক ছোট ছেলেমেয়েও ছিল। এদের বলে metis অর্থাৎ মিশ্র। এদের পরের প্রজন্ম এখন বেলজিয়ান নাগরিক। আর রাগ তাদেরই বেশি।

ব্রাসেলসের সব থেকে সুন্দর পার্ক বা বোটানিক্যাল গার্ডেন যাই বলুন, যেটাকে বলে রয়াল গ্রিনহাউস— ব্রাসেলসের একটু বাইরে লেকেন বলে একটা জায়গায় লোক আজকাল কম যায়। আমি গিয়ে প্রায় খালি পেয়েছি। অদ্ভুত ভালো বোটানিক্যাল গার্ডেন। কিন্তু যেদিন জানতে পেরেছি যে পুরোটাই কঙ্গোর ক্রীতদাসদের দিয়ে তৈরি করানো, তারপর আর যাইনি।

তাই বলে কি বেলজিয়ানরা খারাপ? একেবারেই নয়। এরকম মিশুকে জাত খুব কম দেখা যায়। তবে আমি বলব, নিজেদের ইতিহাস সম্বন্ধে একটু অন্ধ। এটাও হতে পারে, যে লজ্জা পায়। যেমন আজকের দিনে জার্মানিতে নাৎসিদের নিয়ে কথাবার্তা বলাটা অভদ্রতার পর্যায় পড়ে, প্রায় তেমনই। ওই বিষয়টা বাদ দিলে, বেলজিয়ামের মতো শান্ত, সুন্দর, ভদ্র দেশে বারবার আসতে ইচ্ছা করবে। কিন্তু বাদ কি সত্যিই দেওয়া যায়? বড়ো বড়ো মিউজিয়াম আর গির্জা দেখবার সময় কঙ্গোর ক্রীতদাসদের কথা তো মনে পড়ে। ব্রিটিশদের অত্যাচার আর লুটতরাজ আমরা কি ভুলতে পেরেছি, না ভুলতে চাই? কঙ্গোর লোকেরাই বা কেন চাইবে?

লিওপোল্ড আর কঙ্গো নিয়ে যদি জানতে চান, শুধু দুটো বই সুপারিশ করবো। একটা তো সবাই পড়েছেন, জোসেফ কনরাডের 'হার্ট অফ ডার্কনেস'। আর অন্যটা এডাম হকশিল্ডের। যদি পারেন, নিশ্চয় পড়বেন। 'কিং লিওপোল্ডস ঘোস্ট'। সত্যি বলতে, এই দ্বিতীয় বইটাই (১৯৯৮) সমগ্র পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, আর কঙ্গোর অত্যাচারের ছবিটা সবার সামনে তুলে ধরেছিল।

ফুটকি-সমাচার

পবিত্র সরকার

মুদ্রিত বাংলা হরফে নতুন চেহারা

এরই মধ্যে ফাল্গুনের প্রথম *আরেক রকম*-এ একটি চিঠিতে শ্রীউপাসক কর্মকার প্রশ্ন তুলেছেন, একটি জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক পত্রিকায় বর্গীয় জ-এর নীচে যে ফুটকি চিহ্ন দেওয়া হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে, তার অর্থ কী? এই প্রশ্নটা কিছুদিন হল ফেসবুক এবং অন্যান্য মঞ্চেও ঘোরাফেরা করছে। আশা করি অনেকেই উত্তরটা জানেন। যতদূর জানি শ্রীকর্মকার বাংলার মুদ্রণ-ইতিহাসে স্বনামধন্য পঞ্চানন কর্মকারের উত্তরপুরুষ, এবং এ সব বিষয়ে তাঁর প্রচুর আগ্রহ আছে, কাজেই উত্তরটা তাঁর জানা নেই দেখে বিস্মিত হলাম।

কীভাবে এটা হল

রহস্য আর কিছুই নয়, ওই প্রতীকটি (জ-এর নীচে ফুটকি— *আরেক রকম*-এর হরফ সজ্জাকরকে বিব্রত না করে বর্ণনা দিয়েই কাজ সারছি) হল ইংরেজি ও অন্যান্য অনেক ভাষার 'Z' ধ্বনির প্রতীক। এটা হাতের কাছে ছিল না বলেই পরশুরাম তাঁর ‘চিকিৎসা সঙ্কট’ গল্পে ‘হয়, হয়, Z আনতি পার না’ (এখানে ‘আ’-এর বদলে ‘আ-কার’ হবে) লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার অনেক পরে, কে করলেন প্রথম জানি না, সম্ভবত বুদ্ধদেব বসু, এইরকম ফুটকি দিয়ে জ লেখা শুরু করেছিলেন, যেমন জার্মান 'W'-র বদলে ‘ভ্ব’ লেখাও সম্ভবত তিনিই প্রথম শুরু করেছিলেন। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই, বুদ্ধদেব বসুর ছাত্রছাত্রীরা সম্ভবত এ বিষয়ে আমাদের জানাতে পারবেন। ‘ভ্ব’ চলেনি, কিন্তু ফুটকিওয়ালা ‘জ’, মনে হয়, স্থায়ীভাবে বাংলা মুদ্রণে ঢুকে পড়েছে।

এর আগেও এ ধরনের কাজ হয়নি তা নয়। ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান নামে এক প্রকাশকের Wordmaster Dictionary নামে একটি প্রকল্পের সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়েছিলাম ২০০৮ নাগাদ, বাংলা প্রতিশব্দ আর উচ্চারণ যোগ করে তার প্রথম সংস্করণ বেরোয় ২০০৯ সালে। তাতে ওই ফুটকিওয়ালা ‘জ’ ওই একই ধ্বনি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছিল। সেই সঙ্গে ফুটকি দিয়ে ‘থ’, ‘দ’ ‘ফ’ এবং ‘ভ’ লেখা হয়েছিল, যথাক্রমে ইংরেজি thick-এর th, there-এর 'th', 'f ' আর 'v'-এর ধ্বনি বোঝাতে। সে বই এখনও বাজারে আছে, পাঠকেরা দেখে নিতে পারেন।

কেন নতুন হরফের দরকার হয়?

এটা সবাই জানেন যে, একটা ভাষার বর্ণমালা তাতে যে সব ধ্বনি উচ্চারিত হয় তার সঙ্গে মাপে মাপে মেলে না। অর্থাৎ সাধারণ বাংলা বর্ণমালায় যদি বারোটা স্বরবর্ণ থাকে, আর আটত্রিশটা ব্যঞ্জন আমরা দেখব যে, আমরা মুখে মাত্র সাতটা স্বর উচ্চারণ করি, তাদের নাকি সুরের (অনুনাসিক) রূপান্তর সহ। আর আমরা ব্যঞ্জন উচ্চারণ করি ২৯ বা ৩০টা। তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়? আমাদের উচ্চারিত ধ্বনির তুলনায় স্বরের বর্ণ (এবং তাদের ‘কার’ চিহ্ন কিছু বেশি আছে। আবার কিছু কম আছে কি? হ্যাঁ, দুঃখের বিষয় তাও আছে, আমরা ‘অ্যা’ স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি, কিন্তু তা প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট বর্ণ আমাদের নেই। আমরা আগে দেখিয়েছি যে, বাংলায় দশটার মতো চিহ্ন বা চিহ্নসমবায় দিয়ে আমরা ‘অ্যা’ বুঝিয়েছি— অ্যা, য-ফলা (ব্যর্থ), য-ফলায় আ-কার (ব্যায়াম), আ-কার (জ্ঞান, জ্ঞাত), এ (এক), এ-য় য-ফলা (ভুল হলেও অনেকে লেখেন), এ-য় য-ফলা আ-কার, এ-কার (খেলা, দেখা), মাত্রাওয়ালা এ-কার (বিশ্বভারতীর বইয়ে), য়্যা (বিষ্ণু দে-র লেখায়)। কী কাণ্ড!

এ তো গেল আমাদের মান্য চলিত ভাষা লেখার হিসেব। সব উপভাষা নিয়ে যে বাংলা, তার যত ধ্বনি আছে— তা লেখার যথেষ্ট বর্ণ কি আমাদের বর্ণমালায় আছে? না, তাও নেই। ধরা যাক নোয়াখালির লোকের মুখে ‘কালীচরণ’ কথাটা, কিছুটা যা ‘খালিসরন’-এর মতো শোনায়। এই ‘খ’ আমাদের চেনা ‘খ’ নয়, তা খানিকটা মাছের কাঁটা ফুটলে গলা-খাকারি দেওয়া ‘খ’। তা কীভাবে লিখব? মান্য বাংলায় 'Z' ধ্বনিটা না থাকলেও বাংলার নানা উপভাষায় তা আছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

থেকে শুরু করে বাংলাদেশে তার বিপুল বিস্তার। তা লেখার উপায় ছিল না বলেই পরশুরাম 'Z' ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যশোর-খুলনার ভাষার আদল আনতে।

তা হলে দেখুন, ভাষার বর্ণমালা নিজের ভাষার সব ধ্বনি লেখার ব্যবস্থাই করতে পারে না, তো অন্য ভাষার ধ্বনি। তাতেও তো বিপুল বৈচিত্র্য। কোনো এক ভাষার ধ্বনির তালিকা অন্য ভাষার ধ্বনির তালিকার মতো নয়। এমনকী যে সব ধ্বনি এক বলে মনে হয় সেগুলিও হুবহু এক ভাবে উচ্চারিত হয় না, অন্য ভাষায়। বাংলা 'প, ত, ক' আর ইংরেজি 'p, t, k' এক নয়। তাদের উচ্চারণ-স্থান ভিন্ন, তাদের ব্যবহার ভিন্ন।

আমাদের তা নিয়ে মাথাব্যথা কেন?

মাথাব্যথা এই কারণে যে, যখন আমরা অন্য ভাষা জানি, এবং সেটা 'শুদ্ধ' ভাবে জানি বলে লোককে জানাতে চাই, তখন আমরা দেখাতে চাই যে, ওই শব্দটার মূল উচ্চারণ এইরকম। এতে লোকের উপকারও হয়, কারণ অন্যরা যারা ওই ভাষাটা শিখতে চায় তারাও বুঝে নেয় যে উচ্চারণটা ওই ভাষায় এইরকম। কারণ এখন বাঙালিরা তো বটেই, পৃথিবীর অনেক মানুষ অদ্ভুত দুটি ভাষা জানে, এবং দুটি ভাষা জানে বলে তারা এও বোঝাতে চায় যে, দুটি ভাষার শব্দগুলির ঠিকঠাক উচ্চারণ সে জানে। তাই সে 'নোখতা' বা 'হরকত' (diacritics) বা বাড়তি চিহ্ন দিয়ে সেই উচ্চারণটা দেখাতে চেষ্টা করে। এতে দোষের কিছু নেই। সংবাদপত্র বা বই তো চিরকালই আমাদের শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে এসেছে।

আগে কী হত?

আগে মৌখিক ভাষা শেখার উপর জোর ছিল না, দু-পাতা ইংরেজি পড়তে বা লিখতে পারলেই হত। ফলে আমাদের ইংরেজি ভাষার উচ্চারণ ছিল বাঙালি বা ভারতীয় ধরনের। Indian English, বাবু ইংলিশ নামে তা বিখ্যাত হয়ে আছে, অনেকেরই ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে তা। আমরা 'জ' আর 'Z'-এ তফাত করতাম না, 'ফ' আর 'f' এবং 'ভ' আর 'v'-তে, এই রকম আরও অনেক কিছুতে। এখনও অনেকে করি না। নিরক্ষর লোকেদের কথা ছেড়েই দিলাম, তাঁরা তো ট্রেনকে 'টেরেন', 'ব্ল্যাক'-কে 'বেলাক', 'স্টু'-কে 'টু' 'স্টেশন'-কে 'ইস্টিশন' বলতেই পারেন, কিন্তু আমরা যারা পড়তে পারলাম ইংরেজি ভাষাটা তাঁরাও অনেক সময়, বানান পড়ে উচ্চারণ (spelling pronunciation) করতে লাগলাম, ইংরেজি শব্দেরও। ইংরেজিতে কী উচ্চারণ তা জানবার চেষ্টা করলাম না, আর তখন হয়তো জানা সহজও ছিল না। সাহেবদের ধরে উচ্চারণ শুনব কেমন করে, আর তত প্রযুক্তিও তো আসেনি। রেকর্ড, ফিল্ম— কিছুই হাতের কাছে ছিল না। তাই আগেকার লোকেদের কথায় 'কৌন্সিল', 'গৌন', 'বুটম' (যা থেকে বাংলা 'বোতাম' হয়েছে), 'টারজেট' (target), লিসটেন (listen) ইত্যাদি উচ্চারণ আমরা শুনতে পেতাম। এখন শহরাঞ্চলে তার প্রকোপ কমে গেছে।

ইংরেজির মধ্যে দিয়ে বিদেশি শব্দ যে সব এসেছে তার আবার আমরা ইংরেজি ধরনের উচ্চারণ করতাম। তাই জার্মান nazi যেখানে 'নাটসি' সেখানে আমরা 'নাজি' বলি, 'Z' উচ্চারণও করি না, বাংলা বর্গীয় জ উচ্চারণ করি। প্রথমটা উষ্মধ্বনি আর দ্বিতীয়টা ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন বললে হয়তো ব্যাকরণের কচকচিতে পাঠক বিভ্রান্ত হবেন। এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। গ্রিক অয়দিপৌস হয়েছে যেমন ইডিপাস। জাপানি 'কিয়োতো' হয়েছে 'কিয়োটো'। আমাদের এই লেখায় বাংলাতেও আমরা সব মূলের উচ্চারণ আনতে পারিনি।

যখন ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে আমাদের আত্মবিশ্বাস ক্রমশ বাড়তে থাকে, যেমন ইংরেজির ক্ষেত্রে আমাদের আত্মবিশ্বাস আমরা বাড়াতে চাইছি, তখন এই সব ভুল উচ্চারণ থেকে আমরা নিজেদের সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। ঠিক উচ্চারণটিকে যে আমরা জানি তা বুঝিয়ে দিতে চাই।

ঠিক উচ্চারণ বোঝানোর কী কী উপায় আছে?

একটা হল ভাষাবিজ্ঞানের উপায়— সেটা বেশ খটোমটো, সকলেই শিখে উঠবে এমন আশা করা অন্যায়। তার নাম আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান বর্ণমালা বা International Phonetic Alphabet, সংক্ষেপের আধ্বব বা IPA। উচ্চারণ অভিধানে আপনারা তার ব্যবহার দেখেছেন। ইন্টারনেটে তা ধরা আছে, যে কেউ ইচ্ছে করলে নামিয়ে নিতে পারেন। আবার বলি যে, সাধারণের পক্ষে তা ব্যবহারযোগ্য নয়, পণ্ডিতেরা সেটা নিয়ে সুখে থাকুন।

আরো নানা উপায় তৈরি হয়েছে এখানে ওখানে। কিন্তু সবচেয়ে সহজ উপায় হল, আমার নিজের অভ্যস্ত বর্ণমালাটাকেই একটু এদিক ওদিক করে নেওয়া, দু-একটা বর্ণতে ওই নোখতা লাগিয়ে একটু ভিন্ন চেহারা দিয়ে উচ্ছিষ্ট ধ্বনিটা বোঝানো। এখন অনেকেই সেটা করছেন। কম্পিউটার প্রযুক্তি হাতে আসায় এটা সহজ হয়ে যাচ্ছে, ইউনিকোডও প্রতিটি বর্ণমালার জন্য এই ধরনের কিছু সুযোগ রেখে দিচ্ছে, বাংলার লেখার বিভিন্ন সফটওয়ারও সেইভাবে তৈরি হচ্ছে। আমাদের সেই অভিধানে আমরা কম্পিউটারেই নতুন বর্ণগুলি (ফুটকি দেওয়া) তৈরি করেছিলাম।

এটাকে কীভাবে দেখা উচিত?

কাজেই এ সবের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ভাষায় যেমন নতুন শব্দ ইত্যাদি আসে, তেমনই নতুন চিহ্নও দরকার হতে পারে সময়ের দাবিতে। যদি তা আমাদের অবাক করে বা আহত করে (বিষয়টা জনি না বলে) তা হলে সেটা যথার্থ প্রতিক্রিয়া নয়। সকলে কারণ ব্যাখ্যা করে অভিনবত্ব আনেন না, ধরে নেন বিষয়টা সকলেই বুঝে নেবেন। কিন্তু এই প্রত্যাশা সব সময় সত্য হয় না বলেই চিঠিপত্রে ফেসবুকে এত প্রশ্ন, এত আলোচনা। তা এক হিসেবে স্বাস্থ্যকর লক্ষণ, সব কিছু আমরা বুঝে নিতে চাই।

শিল্পী : রবীন মণ্ডল

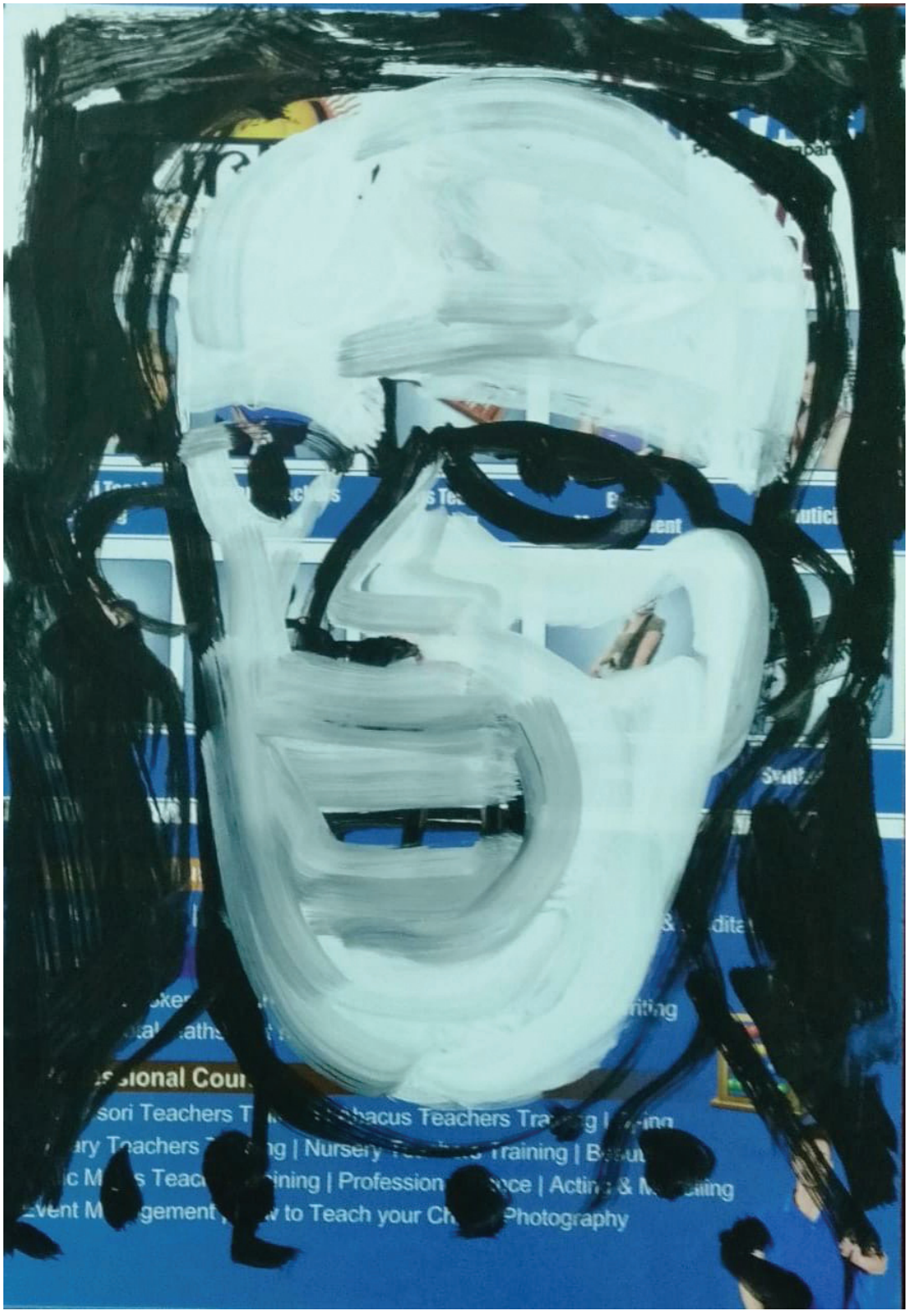

ছবি : সুরজিৎ সরকার

UTTORA

Good Living Got Better

Our New Project

At

Bagdogra, Darjeeling District

Luxmi Portfolio Ltd.

Issue date 1 July 2020. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 8, Issue 8 Arek Rakam

mio amore™
THE CAKE SHOP

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.

Rs. 30